তোমার যবনিকা

আশাপূর্ণা দেবী

প্রথম প্রকাশ—চৈত্র, ১৩৪১

প্রকাশক
এস. এন. পাল
সাহিত্য সংস্থা
৯, নবীন পাল লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
সুধীর পাল
সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১৪/১/এ, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ
পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান
১৮এস, টেম্পলিং হাউস
কলিকাতার লেন

ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু

হচ্ছে ওই নাম। আপনার অজ্ঞান শৈশবে যে নামটিকে আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাকে টেনে নিয়ে চলতে হবে শুধু আমৃত্যুই নয়, মরণের পর পর্যন্ত।

কখনো কখনো ওই ওপরওলারাই নিজেদের গড়া নামটাকেই ছেঁটে-কেটে, মুচড়ে-দুমড়ে, ভেঙেচুরে সুবিধেমাফিক করে নেন, তার জন্যে নামের শোভা সৌন্দর্য থাক যাক, বয়ে গেল। কিন্তু নামের মালিকের অবস্থা একই। সে-ও তো অচৈতন্যকালেই। চৈতন্যকালে হলে কি আর এই অতি আধুনিকা নয়না গোস্বামী তার এই অতি-সেকেলে নামের ভারটা বয়ে বেড়াতো?

পাড়ায় একটা বুড়ি নাপতিনী আছে, একদা তার নাম হয়তো ছিল নয়নতারা, সবাই তাকে বলে নয়না নাপতিনী। তাহলেই বুঝুন? তাছাড়া—ওর ওই আসল পোশাকী নামটা? স্রেফ জরিদার বেনারসী শাড়ির মতোই জবড়জং। তাকেই তো রাখতে হয়েছে ইউনিভার্সিটির খাতায়। অথবা নিজেই সে অমোঘ নিয়মে নিজের গতিবেগে স্কুল থেকে কলেজে এবং কলেজ থেকে ইউনি-ভার্সিটির উঠোনে এসে চেপে বসেছে।

এতো খারাপ লাগে নয়নার। আরো খারাপ লাগে যখন যে কেউ নামটাকে প্রথম শোনে সে-ই কিছু-না-কিছু একটা মন্তব্য করে বসে। না করে ছাড়ে না।

কুরঙ্গী নয়না! বানান জানিস?

কুরঙ্গী নয়না? ও বাবা! খুব নাম তো!

কুরঙ্গী নয়না! কে রেখেছিল এ-নাম? কেমন যেন খটমটে বাপু।

কুরঙ্গী নয়না! শুনিনি কখনো বাবা!

আবার হঠাৎ হঠাৎ কেউ খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠে—বাঃ অদ্ভুত সুন্দর নাম তো! কে রেখেছিল নামটি? বেশ সুন্দর ধরনের।

এই রকম উচ্ছ্বসিত গলায় বলে উঠেছিল দীপক ঘোষাল—আশ্চর্যসুন্দর নাম তো! নামটা যিনি চয়েস করেছিলেন, তিনি এখনো ইহলোকে আছেন!

নয়না মৃদু হেসে বলেছিলো, আছেন। আমার দাদু মানে মায়ের বাবা। নিজের নামটা বড়ই নিরলঙ্কার বলেই বোধ হয় নাতনীর ঘাড়ে খানিকটা অলঙ্কার চাপিয়েছিলেন।

কী নাম? রাম? শ্যাম? যদু-মধু?

নয়না ওর সপ্রতিভতায় অবাক হয়, কৌতুকও অনুভব করে। হেসে বলে, কাছাকাছি। নাম বিধুশেখর। বিধুশেখর ভট্টাচার্য। সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন, আর বাকি সময়টা—কিন্তু কী হবে তার খবর জেনে?

দীপক বলেছিল, ইচ্ছে হচ্ছে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে আসি।

অভিনন্দন? কী বাবদ?

দীপক বলেছিলো, দুটো বাবদ। এক নম্বর হচ্ছে রুচির জন্যে, এ-রকম রুচি দুর্লভ। দু নম্বর, নামটা এমন খাঁটি অর্থবহ যে মনে হচ্ছে, এ ছাড়া আর কোনো নামে এমন মানাতো না আপনাকে।

চালাক মেয়ে নয়না ধরে নেয়, এ হচ্ছে আলাপ জমাবার ফিকির, চতুর ছেলেরা এইভাবেই কোনো মেয়ের সঙ্গে নতুন আলাপ জমায়। হয় তার শাড়ির রংয়ের, নয় তার হাতের ব্যাগের, নয় তো-বা তার গানটানের উচ্ছ্বসিত খানিকটা প্রশংসা করে, কথার জাল বুনে জাল ফেলে।

নয়নার নামটাই ওকে বেশ একটা সুবিধে দিয়েছে।

কিন্তু নয়নাই-বা হারবে কেন? নয়না বলে উঠেছিল, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

মোটেই না, দীপক বলেছিল, মনে হচ্ছে ভাল লাগার তুলনায়, কিছুই বলা হলো না। সত্যি এতো চমৎকার নাম আমি জীবনে শুনিনি।

আপনার নিজের নামই-বা কী এমন খারাপ?

হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ দীপক আছে। কিন্তু আপনার নামের আর একটা মেয়ে বার করুন।

নয়না হেসে ফেলে বলেছিল, কোনো সংস্কৃত পণ্ডিতের বাড়ি গিয়ে খুঁজে দেখলে মিলতে পারে।

দীপক বিশেষ একটু গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে হেসে বলেছিল, নামটা হয়তো পেলেও পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু মানেটা কি মিলবে।

এইভাবে আলাপের শুরু। দীপক ঘোষালের সঙ্গে নয়না গোস্বামীর। ইউনিভার্সিটিতে এসে কয়েকটা দিন ক্লাস হবার পর।

খবরটা ছড়িয়ে পড়তে অবশ্য ঘণ্টাখানেকও দেরী হলো না। রত্না বলল বাসবীকে, বাসবী বলল শান্তনুকে, শান্তনু প্রবীরকে, প্রবীর ইলাকে, ইলা জয়তীকে, জয়তী নবীনাকে, নবীনা শুভেন্দুকে। কথাটা আর কি?

দীপকটার হয়ে গেল। কুরঙ্গী নয়নার সঙ্গে জমে গেল।

ওঃ দীপকবাবুর সে কী গভীর দৃষ্টি! অফ-এর সময় দেখলাম তো বারান্দা থেকে।

দীপককে তো একটু গম্ভীর বলেই মনে হতো—এতো হাল্কা তা জানতাম না। দেখলো আর লটকালো।

লটকাবে না? নামটি কেন রেখেছে বাপ-মা? ঐ নামের বানেই একেবারে ঘায়েল।

হতে হয় না। আমায় আসুক দিকি ঘায়েল করতে?

তুই আর বলিস না প্রবীর, তুই তো মরেই পড়ে আছিস। নতুন করে আর কী ঘায়েল করবে তোকে? মেয়েরা মৃতদেহ ছোঁয় না, বুঝলি? বলে উঠলো ইলা।

মেয়ে-গলা আর ছেলে-গলায় মিলিত কলহাস্যে কমনরুম মুখরিত হয়ে ওঠে।

আসল কথা, এদের মধ্যে কয়েকটি মেয়ে একই কলেজ থেকে এসেছে, আগে থেকেই পরিচয়, ছেলেগুলোও কেউ চেনা, কেউ ইউনিভার্সিটিতে পা দিয়েই ভাব করেছিল, নয়নাই একবারে আনকোরা আর নয়না ভর্তি হয়েছে একেবারে শেষ ঘেঁষে।

ওকে প্রথম দেখেই শান্তনু বলেছিল, এই সাংঘাতিক চোখওয়ালী মেয়েটা আবার কোথা থেকে এলোরে রত্না? আগে তো দেখিনি।

রত্না শান্তনুর মামাতো বোন, দুজনে আসেও একই সঙ্গে। বোধ হয় একই পাড়ায় থাকে। তা বাচাল মেয়ে নবীনা ওদের নিয়েও ঠাট্টা করতে ছাড়ে না। শান্তনু বলে, এই খবরদার! ও আমার বোন হয় না?

নবীনা হি হি করে হেসে বলে, তুতো বোন তো? ওতে কিছু আটকায় না।

বাচালতা করবে বলেই করা নবীনার।

রত্না বলেছিল, ওই চোখওলা মেয়েটা একেবারে টাট্‌কা ভর্তি হয়েছে।

নাম কি? বলেছিল শুভেন্দু।

জানি না। জেনে নিবি।

আমার দায় পড়েছে। তোর ইচ্ছে হয় তুই জেনে নিগে যা না।

এক্ষুনি পারি, তবে কে জানে কী স্বভাবের মেয়ে। যদি তেমন পিউরিটান হয়, হয়তো জিজ্ঞেস করতে গেলেই খ্যাক করে কামড়ে দিতে আসবে।

তাহলে তো খুব সাহসী হাল! কামড় খাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েই এগোতে হয়, বুঝলি? ধরে নিস সব মেয়েই প্রথমে খ্যাক করে কামড় দেবার জন্যেই দাঁত শানিয়ে থাকে।

বিশ্বাস করি না। তোর এই বাচাল বন্ধুটা—কী যেন নাম? প্রবীণা—না? ওর দাঁত আছে? সে দাঁত শানায়? বরং গায়ে পড়বার জন্যেই হেদিয়ে আছে।

নবীনাকে আর কেউই নবীনা বলে না, বলে প্রবীণা। ওটাই মজা। নাম নিয়ে মজা। অধ্যাপকদের নিয়েও তুমুলভাবেই হয়।

নবীনাই ঐ সকল কাজে অধিক অগ্রণী।

নবীনাই তদ্দণ্ডে খবর এনেছিল, ওর নাম কুরঙ্গী নয়না।

কী নয়না?

আরে বাবা, বললাম তো কুরঙ্গী নয়না।

প্রবীর বলল, মানে কী?

ন্তাকামী করতে হবে না? কুরঙ্গী মানে জানো না?

হরিণী, হরিণী। বুঝলে?

বুঝলাম না। নাক ঘুরিয়ে কান দেখানো কেন বাবা? সোজা-সুজি সেটা বললেই হতো।

সোজা দিয়েই সব চলে বুঝি?

তা নামটার জন্যেই হোক, আর ভয়ঙ্কর সুন্দর চোখ দুটোর জন্যেই হোক, নয়নার ওপর নজর রইল সকলেরই। তাই যে মুহূর্তে দীপক ঘোষাল নামে ছেলেটা একবার গভীর চোখে তাকিয়ে বলল, নামটা হয়তো মিললেও মিলতে পারে, কিন্তু নামের মানেটা? সেটা কি মিলবে?

সে মুহূর্তেই প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগাযোগের মাধ্যমে ঘোষিত হল, দীপকটার হয়ে গেল। কুরঙ্গী নয়নার সঙ্গে জমে গেল।

তারপর অবশ্য আবার ওই নতুন মেয়েটার সঙ্গেই সকলের বেশী ভাব হয়ে গেল। গুণটা বলতে কি নয়নারই। খুব মিশুক মেয়ে। সরল ও নিরহঙ্কার।

বুদ্ধির সঙ্গে সারল্যের, আর আত্মসম্ভ্রমের সঙ্গে অহমিকাহীনতার ভারী চমৎকার সমন্বয় আছে নয়নার চরিত্রে। ওকে বিরুদ্ধ সমালোচনা করব বলে প্রতিজ্ঞা করলেও করা যায় না।

এই শিক্ষা অর্জন করেছে নয়না তার দাদামশাই বিধুশেখরের কাছ থেকে।

নয়নার শৈশব ও বাল্যের শিক্ষাটা দাদুর কাছেই। নয়নার রেলবাবু বাবার বদলীর চাকরী, প্রথম সন্তানের লেখাপড়ার অসুবিধেটা বরদাস্ত করতে পারেননি নয়নার মা, তাই বছর ছয়েকের মেয়েটাকে বাবার কাছে ধরে দিয়ে বলেছিলেন, বাবা, এটাকে আপনার কাছে ফেলে দিয়ে যাচ্ছি—যা করবার আপনি করবেন।

অবশ্য নয়নার মা মহাশ্বেতা দেবীর অন্যদিকেও বুকের বল ছিল,

বাপের অন্তঃপুরের দায়-দায়িত্বের ভার ছিল বিধবা দিদি পত্রলেখার ওপর।

নিঃসন্তান বালবিধবা পত্রলেখার মেজ বোনের ওই মেয়েটার উপর ছিল সাতখানা প্রাণ। নয়নার জন্মকালে মহাশ্বেতা ভুগেছিল বিস্তর, তখনই ওই পত্রলেখার ঘাড়েই পড়েছিল শিশুর ভার। পত্রলেখাদের মা তো কবেই গত।

নয়নার বাবা তাঁর স্ত্রীর কাছে শ্বশুরের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে উল্লেখ করতে গেলেই বলতো—হবে না কেন? যৌবনকাল থেকে স্বাধীন মুক্ত পুরুষ। অখণ্ড অবসর পেয়েছেন বিদ্যাচর্চার।

তার মানে, বৌরাই পণ্ডিত হবার পক্ষে বাধা? রেগে গিয়ে বলতো মহাশ্বেতা।

নিশিনাথ বলতো—তা আবার বলতে? জীবিকার প্রয়োজন ব্যতীত সময়ের সবটুকুই তো বৌয়ের চরণে উৎসর্গ করে দিতে হয়।

কে বলেছে দিতে?

না দিলেই অশান্তি।

ওঃ, তুমি বলতে চাও বৌ মরে না গেলে কেউ পণ্ডিত হয় না?

নিশিনাথ হেসে বলতো, ব্যাচিলাররাও হয়।

বৌ-সম্বলিত কোন লোক পণ্ডিত হয় না?

হলে অশান্তি করে হয়। শুধু পণ্ডিত কেন, শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি-বৈজ্ঞানিক সকলের ব্যাপারেই ওই একই প্রশ্ন।

ঠিক আছে, আমি একদিন তোমার ওই রেললাইনে গলা দিয়ে পড়ে থাকবে, দেখবো তারপর তোমার কতখানি উন্নতি হয়।

নিশিনাথ হেসে হেসে বলতো, যদি গ্যারাণ্টি থাকতো দেখবে, দেখাতে পারবো, তাহলে সেই রেললাইনটায় শান্ দিইয়ে রাখতাম।

ভারী হাসি-খুশী মানুষ ছিলো ভদ্রলোক। নয়না যখন স্কুল ছুটির সময় মা-বাবার কাছে যেতো, মার দিকে তেমন ঘেঁষত না, বাবাতেই বিভোর থাকতো।

বাবার কাছেই ছিলো যতো প্রশ্রয়।

এতোটুকু বেলার কথা থেকে মনে পড়ে, ছুটির দু দিন যেতে না যেতেই মা বললো, এই নয়না, শেলেট-পেন্সিল এনেছিলি না? 'বর্ণ পরিচয়' এনেছিলি না? তা সে সব কি শুধু আমায় দেখাতে? সারাদিন কেবল খেলে বেড়ানো হচ্ছে। যা, নিয়ে আয় সে সব, পড় আমার এখানে বসে।

নয়না মলিন মুখে 'বর্ণ পরিচয়' এবং শ্লেটখানা হাতে নিয়ে শ্লেট-পেন্সিল আর স্পঞ্জের টুকরোটুকু খুঁজে বেড়াতো, আর বাবা চুপি-চুপি বলতো, এই, খবরদার, যাসনি ওদিকে। বৈঠকখানা ঘরে পালিয়ে আয়। ছুটির মধ্যে আবার পড়া কী রে? তবে আর ছুটির মানে কী হলো?

নয়না তাকিয়ে দেখতো, বাবার চোখ দুটো হাসির আলোয় জলজল করছে, বাবার মুখটা হাসিতে ভরা। বাবা কী সুন্দর দেখতে! ভাবতো নয়না।

অথচ গৌরব করার মতো রূপের বালাই ছিলো না নিশিনাথের। রূপ ছিলো মহাশ্বেতার। সুন্দরী যাকে বলতে হয়। কিন্তু শিশুর চোখের মাপকাঠি কি বয়স্কদের মাপকাঠি মেনে চলে?

বাবার কাছে যাবার আর এক আকর্ষণ নিত্য-নতুন দেশ দেখতে পাওয়া। খুব তাড়াতাড়ি বদলী হতে হতো নিশিনাথকে।

সামান্য সামান্য মনে আছে নয়নার অনেক দেশের কথা।

সাহেবগঞ্জের কথাটা বড় বেশী মনে পড়ে নয়নার। নিশিনাথ তখন সেখানের স্টেশন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন।

অল্প বয়সে বিপত্নীক বিধুশেখর ছোট ছোট তিনটে মাতৃহীন মেয়েকে যেন-তেন করেই মানুষ করে তুলেছিলেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে দিয়ে ফেলেছিলেন, অতএব জামাই নির্বাচনের ব্যাপারে খুব একটা মহিমা দেখতে পারেননি। কেউ রেলবাবু, কেউ স্কুলমাস্টার। বড়টির যদিও-বা একটা ভালো বিয়ে দিয়েছিলেন, ছেলেটি ক্যাম্বেল স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে কারমাইকেলে পড়তে ঢুকেছিল। সে জামাই তো বেশীদিন ভাগ্যে সইল না।

বিধবা হয়ে ফিরে এসে আবার বাপের সংসারে ভর্তি হলো পত্রলেখা। তা এ পৃথিবী হয়তো এরকম একটা নিয়মেই চলে, একদিকে ভাঙ্গন, অন্য আর একদিকে গঠন। যুবতী মেয়ে বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি ফিরে আসায় বিধুশেখর কাতর হলেন যতখানি, আশ্বস্ত হলেন তার থেকে অনেক বেশী। বলতে গেলে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। ছোট মেয়ে কাদম্বীর বিয়ে হয়ে যাওয়ায় বিধুশেখর যেন অথৈ জলে পড়েছিলেন, পত্রলেখা এসে আবার সে সংসারের হাল ধরল।

মাতৃহীন সংসারে বড় মেয়ে পত্রলেখাকেই একদা সংসারের হাল ধরতে হয়েছিল, ছোট থেকেই সে নিপুণ মাঝি। মাঝে কয়েকটা বছরের জন্যে হাতের হাল নামিয়ে রেখে, অন্য নৌকোয় গিয়ে উঠতে হয়েছিল, সে নৌকো ডুবি হলো, অতএব হাত থেকে নামিয়ে রেখে যাওয়া সেই হালটাকে (যেটা নাকি দুটো অপটু নাবিক একবার করে হাতে ধরেছিল কিছু দিনের জন্যে) পাকাপাকিভাবে নিয়ে গুছিয়ে বসল। যেন ওর যথার্থ জায়গাটিতেই বহাল হলো।

নৌকো চলতে লাগল তরতরিয়ে, বিধুশেখরের অলক্ষ্যে যে স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল তার জন্যে ঈশ্বরের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে মনে মনে বললেন, ঠাকুর আমি যে এতবড় স্বার্থপর তা জানতাম না। কিন্তু এ মনও তো তোমারই দেওয়া। কী করব বল?

পত্রলেখার বৈধব্য মহাশ্বেতারও ওই সুবিধেটি এনে দিয়েছিল। নইলে মেয়েকে বাবার হাতে তুলে দিয়ে শিক্ষা-দীক্ষা দেবার বাসনাটা কি মিটত তার? মেয়ের বাবার ওপরে তার আর যাই থাক আস্থাটা তো ছিল না।

মহাশ্বেতার বিচারে লোকটা যারপর নাই তরলচিত্ত এবং কাণ্ডজ্ঞান শূন্য। 'জীবন' নামক বস্তুটা যে ভয়ঙ্কর একটা সিরিয়াস বস্তু, এ জ্ঞানের বালাইমাত্র নেই তার।

লোকটা তবলা বাজায়, তাস খেলে, যাত্রা-থিয়েটার দেখতে ভালোবাসে এবং কোথাও গান হচ্ছে বা কীর্তনের আসর বসেছে

খবর কানে এলে অনায়াসে পাঁচ-সাত মাইল রাস্তা হেঁটে পাড়ি দেয়।

নিজের বাচ্চা মেয়েটার কান্না আবদার ভোলাতে ও অনায়াসে হাঁড়ি ডেকচি যা সামনে পায় তাই বাজিয়ে তারস্বরে গান গাইতে পারে এবং তাতেও কাজ না হলে মেয়েকে ঘাড়ে করে পাড়া বেড়িয়ে আসতে পারে।

এ নিয়ে রাগারাগি করলে কিছুমাত্র রাগ না করে হাহা করে হেসে ঘর ফাটায়। যেন মহাশ্বেতা নামে মহিলাটির রাগটা তার কাছে একটা আমোদের জিনিস। মেয়ের সামনেও একটু সামাল নেই।

বিধুশেখর ভট্টাচার্যের মেয়ের পক্ষে এগুলো বরদাস্ত করা সহজ নয়। কিন্তু বৃথা শক্তি ক্ষয় না করে মহাশ্বেতা মেয়েটাকে এই আওতা থেকে সরানো শ্রেয় মনে করে মেয়েকে নিজের বাবার কাছে রেখে গিয়েছিলো। বিধুশেখর ওকে পাড়ার স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে নিজে সত্যিকার পড়ানোর দায়িত্বটা হাতে তুলে নিয়েছিলেন।

সত্যি বলতে, নয়না যেন তাঁর একটা আনন্দের বস্তু ছিল।

নিজের জীবনে শুধু তিনটে মেয়েই হাতে পেয়েছিলেন বিধুশেখর। তাই ওটাই অভ্যস্ত বলে নয়, ছোট্ট মেয়েটার মেধা বুদ্ধি সপ্রতিভতা এবং মুহূর্তে সব কিছু ধরে ফেলবার ক্ষমতা বিধুশেখরকে যেন অভিভূত করতো। সত্যি বলতে, নিজের মেয়েদের নিয়ে তিনি কখনো এ আনন্দের স্বাদ পাননি। তারা তিনজনেই প্রায় তাদের পরলোকগতা মায়ের মতোই ভোঁতা গোছের।...বড় মেয়ের যদি-বা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আছে, কিন্তু সেটুকু স্রেফ সংসারের কাজেই লেগে যায়। পড়তেই-বা পেরেছে কদিন?

নয়না, যাকে নাকি বিধুশেখর পুরো নামে 'কুরঙ্গী নয়না' বলেই ডাকেন, সে যেন বিধুশেখরের আনন্দের স্বাদ, সাফল্যের পরিচয়লিপি।

নয়নাকে কোনোদিন পড়তে বসার কথা বলতে হয় না, নাওয়া-খাওয়ার জন্যে তাগিদ দিতে হয় না, বাধ্যতার শিক্ষা দিতে হয় না।

কিন্তু বেচারী মহাশ্বেতার এমনই ভাগ্য—বাপের কাছে গিয়ে

জুটলেই মেয়ে যেন অন্য মেয়ে। ছুটি-ছাটায় তো গিয়ে জুটতেই হবে।

সেখানে নয়না বেপরোয়া খেলে বেড়াবে, বাপের সঙ্গে বাপের অফিসে চলে গিয়ে বসে থাকবে, নাওয়া-খাওয়ার তাগাদা দিয়ে ডাকাডাকি করলে 'ভালো লাগে না বাবা', 'এখন আমার ইচ্ছে করছে না' বলে মায়ের মুখের ওপর ঝঙ্কার তুলে অবলীলায় সরে পড়বে।

ঘুরবে বাবার পায়ে পায়ে।

দু' ক্ষেপ ডিউটি ছিল নিশিনাথের। একবার ভোরে বেরিয়ে বেলা এগারোটা সাড়ে এগারোটায় আসতো, আবার নাওয়া-খাওয়া সেরে বেলা দুটোর সময় ডিউটি দিতে বেরোতো।

নয়না থাকলে নয়না সেই ভোরবেলাই ঘুম থেকে উঠে বাবার সঙ্গে কলকলাবে এবং জবরদস্তি করে বাপের সঙ্গে বাসি পরোটা খেয়ে ব্রেক ফাস্ট করবে। নয়না দুপুরে কিছুতেই শিশুজনোচিত টাইমে স্নান আহার করবে না, 'বাবার সঙ্গে নাইবো', 'বাবার সঙ্গে খাবো' বলে বসে থাকবে। অথচ নিজে যখন মাঝে মাঝে কলকাতায় বাবার কাছে যায় মহাশ্বেতা, মেয়ে দেখে চোখ জুড়িয়ে যায় তার।

রূপে গুণে আলো করা মেয়ে। অথচ—মহাশ্বেতার কাছে গেলেই—তার মানে নিশিনাথের কাছে গেলেই গুণের ভাঁড়ার শূন্য হয়ে যায়।

তুমি একটি অসুর—রেগে রেগে বলতো মহাশ্বেতা স্বামীকে—তোমার প্রভাব এমন যাচ্ছেতাই যে মেয়ে একেবারে অন্য মূর্তি ধরে।

নিশিনাথ হা হা করে হেসে বলতো—অসুরকন্যা বলেই অসুরের প্রভাবে কাজ হয়, কই দেবকন্যাটির ওপর কি প্রভাব পড়াতে পারলাম? বছর দশেক ধরে তো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ফেলিওর। স্রেফ ফেলিওর!

আমার বাবার পুণ্যি যে পড়াতে পারেনি,—মহাশ্বেতা বলতো—গোলাপ গাছে ঘেঁটু ফুল ফোটে না।

শুনে নিশিনাথের আবার সেই হাসি।

ওই হাসিটাই নয়না নামের ছোট্ট মেয়েটাকে মোহিত করতো।

কিন্তু কদিনই-বা সে হাসি শুনতে পেল নয়না? কবেই হারিয়ে ফেলেছে সেই দামী জিনিসটা। তবু নয়না এখনো যেন হটাৎ হঠাৎ সেই হাসিটা শুনতে পায়।···দেখতে পায় ছোট্ট একটা মেয়ে রঙ্গিন ফ্রকের ঝালর আর খাটো চুলের গোছা উড়িয়ে সেই বয়স্ক শিশুটির সঙ্গে মাঠে ছুটোছুটি করছে, হয়তো তুচ্ছ একটা প্রজাপতি ধরতে, হয়তো একটা কাঠবেড়ালীকে তাড়া করতে।

বাবার সঙ্গে গাছতলায় বসে কষা পেয়ারা, টক কুল অথবা নোনা আতা খাচ্ছে—এ ছবি নয়নার মনে জ্বলজ্বল হয়ে আছে।

বাবা হেসে বলতো—মার কাছে গিয়ে খুব গল্প করবি, বুঝলি? বলবি এই এ্যা—তো খেয়েছি।

সেই এ্যা-তোটা এ্যাতো বেশী যে বিশ্বাসের কোঠায় আনা যায় না তাকে। তবু তাই শেখাতো বাবা।

নয়না বলতো—মা রেগে পিটুনি লাগাবে।

বাবা বলতো—ইস, লাগালেই হলো? আমি আছি না। আমার সামনে কে আমার নয়না পুতুলকে পিটুনি দেয় দেখি।

বাবা বলতো নয়না পুতুল।

সাহেবগঞ্জের সেই কোয়াটারটায় কী বিরাট বাগানই ছিল!

মালির হাতে গড়া কেয়ারি করা ফুলের বাগান নয়, অনেকখানিটা ফলের বাগান।···লিচুগাছ ছিল, কতগুলো ছিল আম, জাম, পেয়ারা, কুল, আতার আর তেঁতুল গাছ। বাতাসে তেঁতুল পাতাগুলো ঝিল-মিল করতো দেখে আহ্লাদে বিগলিত হতো নয়না। আর ফলের বাগানেই তো বাসা।

কত বয়েস তখন নয়নার?

বছর আটেক হবে।

নয়নার পরে দুবার দুটি মৃত-সন্তান প্রসব করে মহাশ্বেতার তখন স্বাস্থ্য খুব ভালো, মেয়ের সঙ্গে ছুটোছুটি করে তাড়া লাগাতে আসতে

পারত না, ঝিকে দিয়ে ডাকাতো। নয়না তাকে হুট আউট করে দিত। নয়নার যে পৃষ্ঠবল থাকত গাছের আড়ালে।

অফিস পালিয়ে এসে মেয়ের সঙ্গে হুটোপাটি খেলায় মসগুল থাকত বাবা।

নয়না বলতো—মাকে বল না বাবা, আমি এইখানেই থাকব।

বাবার মুখটায় হতাশার ছায়া পড়তো, তবু হেসে বলতে—ও বাবা, তাহলে তোমার মা আমায় পিটুনি লাগাবে। আমায় কে বাঁচাবে বল? আমার যে আর বাবা নেই?

আহা মা তোমায় পিটুনি দিতে পারে? যতসব বাজে কথা! ইস্কুলের সব ছেলেমেয়েই তো ওদের মা-বাবার কাছে থাকে—

নয়না আবদারে নাকি সুর টানতো—শুধু ছুটিতে দাদুর বাড়ি যায়, আমি কেন উল্টো করি?

বাবা ক্ষুব্ধ। ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলতো—এ বাড়িটা যে উল্টো পুরাণের অধীন, তাই করো।

আমি আর কলকাতা যাব না, আমার এখানটাই ভালো লাগে।

বাবা হেসে বলতো—এখানটায় কি আর বরাবরের জন্যে থাকতে দেবে বাবা? রেল কোম্পানী আবার কোথায় ঠেলে দেবে।

তা হোক, সব জায়গাই কলকাতার থেকে ভালো।

বাবা তখন হাসির গলা বদলে ফেলে বলতো—তা কি আর? আমায় যদি এখন কলকাতায় বদলী করে দেয়, নাচতে নাচতে যাই।

ধ্যাৎ।

ধ্যাৎ কীরে? সত্যি, সত্যি, সত্যি।

বাঃ, কলকাতায় বুঝি এমন গাছ আছে?

তা, নেই বাবা, তবে অন্য অনেক কিছু আছে। বুঝবে বড় হলে। এখানে তুমি পড়ালেখার তেমন সুবিধে পাবে না। ওই যে কী গানটান শেখো, তার সুবিধে পাবে না।

শিখতো নয়না, তখনই গান শিখতো। বিধুশেখর তাকে এক বুড়ো মাস্টার রেখে ভজন শেখাতে শুরু করেছেন।

বাবার কাছে থাকার জন্যে আকুলতা করতো নয়না, কিন্তু আবার কলকাতায় এলেই মনটা সম্পূর্ণ বদলে যেতো। তখন অনুতাপে দগ্ধ হতো এতগুলো দিন শুধু খেলে বেড়িয়েছে বলে! বইপত্তর তো নিয়ে গিয়েছিল সবই। ইস, কী কাজই করেছে! এমন কি গানের সুরটাও তোলেনি একটু।

কী যে হয়েছিল তার?

কোনো কোনোদিন মহাশ্বেতা যদি গানের কথা তুলতো, নিশি-নাথ দিব্যি বলতো—ওসব ভজন-টজন তোর দাদুর বাড়ির জন্যে রাখ নয়না, আমি যে গানটা শেখালাম সেদিন, গেয়ে শোনা মাকে।

নয়নার মনে আছে একদিন মাকে শোনাতে বসেছিল,—কে বিদেশী মন-উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে—।

মা উঠে চলে গিয়েছিলো। মার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। আর একদিন নয়না সদ্য শেখা দুটো লাইন শুরু করেছিল,—কাদের কুলের বৌ তুমি গো—কাদের কুলের বৌ—

মা দুকানে হাতচাপা দিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিলেন,—চলে যা আমার সুমুখ থেকে, চলে যা, আর গান শোনাতে হবে না। ও মনে করেছে এইভাবে আমার শত্রুতা করবে। চিরকাল শত্রুতা করে আশ মিটছে না।

কিন্তু নয়না বুঝতে পারত, কোনো দুরভিসন্ধি নেই—বাবার শুধুই দুষ্টুমী। মাকে ক্ষ্যাপানোই বাবার মজা।

তা বেশীদিন আর সে আক্ষেপ করতে হয়নি মহাশ্বেতাকে। সেই আলো ঝলমলে মানুষটা হঠাৎ একদিন যেন কর্পূরের মতো মিলিয়ে গেল।

শুধু একটি টেলিগ্রাম জানিয়ে দিয়ে গেল—নয়না, তোমার সেই সাহেবগঞ্জে যাওয়ার পথে পাথর পড়ে গেল, তোমার বাবার কলকাতায় বদলী হয়ে আসার সাধ আর মিটল না।

নয়নার সেই হাহাকার করা প্রাণ বিধুশেখরের শান্ত গম্ভীর গম্ভীর হৃদয়ের স্পর্শে আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এল। কিন্তু ভিতরে কোথাও যেন রয়েই গেল সেই উজ্জ্বল উদ্দাম বেপরোয়া মানুষটার প্রভাবের আভাস।

হয়তো দুই বিপরীত প্রকৃতির ভালোবাসায় লালিত বলেই নয়নার মধ্যে বিপরীত দুই প্রকৃতির চমক দেখতে পাওয়া যায়। নয়না কখনো অনেকের সঙ্গে হৈ-চৈ করে কলরোল করে হেসে ঘর ফাটায়, যাকে পায় তাকেই ক্ষ্যাপায়, আবার কখনো একেবারে চুপচাপ লাইব্রেরীতে বসে বই পড়ে এবং কেউ এসে জ্বালাতন করলে হেসে ডাকটাকে এড়িয়ে যায়, বলে—এই, জ্বালাতন করিস না রে, মারাত্মক ভালো একখানা বই পড়ছি।

আড়ালে এসে মেয়েরা বলতো 'ঢং!' ছেলেরা বলতো 'ডাঁট!'

লেখাপড়ায় খুব বেশী ভালোদের ভাগ্যে যা হয়, দু-চারজন তার একেবারে অন্ধ ভক্ত হয়, আর বাকিজনেরা মুখে প্রশস্তি গাইলেও মনে মনে একটু দীর্ঘ 'ঈ'কারের শিকার না হয়ে পারে না। তাই কালো কালো সাধারণ মেয়েরা যে চালচলন দেখালে ওরা গ্রাহ্যও করতো না অথবা অবজ্ঞার হাসি হাসতো, সুন্দরী এবং ব্রিলিয়ান্ট মেয়ে নয়না গোস্বামীর তেমন চালচলন দেখলেই সবাই তার মধ্যে থেকে ডাঁট খুঁজে পেতো, খুঁজে পেতো ঢং!

'সোশ্যালে' গান গাওয়ার অর্ডার হতো নয়নার ওপর, নয়না তার অধীত বিদ্যা ভজনই গাইতো এবং 'ধন্যি ধন্যি'ও পড়তো, কারণ বিধুশেখর ওকে নিখুঁত না করে ছাড়েননি। এবং ভগবানের দেওয়া গলাটা ছিল ওর অদ্ভুত মিষ্টি আর সুরেলা।

কিন্তু ওই ধন্যি ধন্যির আড়ালে মন্তব্য উঠতো—দূর বাবা, প্রাণটা যেন ভিজে কম্বল করে দিলো। ওসব ভজন-ফজন এক-আধটাই সহ্য হয়; পরপর তিনখানা ভজন! হজম করা শক্ত।

ওরা চায় আদিখ্যেতার সুরের আধুনিক গান, হিন্দি সিনেমার চটুল গান, বাংলা সিনেমার ন্যাকা-মার্কা গান।

নয়না কি এসব বুঝতে পারে না?

সবটা না বুঝলেও কানে তুলে দেবার লোকেরও তো অভাব নেই।

নয়না রাগও করে না, গম্ভীরও হয় না। নয়না অগ্রাহ্যের গলায় বলে—বলতে দে। সকলের পেটে আতপ চাল সহ্য হয় না। গোবিন্দ-ভোগ হলেও না।

কিন্তু এসব তো বিগতদিনের কথা। এখন তো ওদের ওই দলটা যারা এক আড্ডায় যোগ দিত, তারা সকলেই ইউনিভার্সিটির মেয়াদ পার করে বেরিয়ে এসে নানা কাজে এদিকে-ওদিকে ছিটকে পড়েছে।

বাসবীটা পাঠ্যকালেই বিয়ে করে মরেছিলো। এম-এটা দেবার পরই দৌড় দিয়েছে বরের কর্মস্থল রৌরকেল্লায়। ইলা একজনের সঙ্গে বেদম ঘুরছে। নির্ঘাৎ শীগগিরই তার গলায় ঝুলে পড়বে। নবীনা ওদের ব্যঙ্গ করে বলেছিল—আমি তোদের মত এতো হাঁদা নই যে, জীবনকে দেখবার জানবার উপভোগ করবার আগেই সকল সম্ভাবনা ঘুচিয়ে গোড়াতেই জীবনের গোড়ায় একটা কোপ মেরে বসবো। বিয়েটা করে ফেলা মানেই তো শেষ হয়ে যাওয়া। আমি এক্ষুনি ও ফাঁদে পা দিচ্ছি না।

বুদ্ধিমতী নবীনা তাই যখন তার মা-বাপ তোড়জোড় করে পাত্র খুঁজছেন এবং অদূর ভবিষ্যতেই সোনার দাম বেড়ে যাবে আশংকায় সোনা কিনে কিনে জমা করছেন, তখন ঝপ্ করে ল কলেজে ভর্তি হয়ে বসলো।

ওর ধারণা ওকালতি করলে রাসবিহারী ঘোষের মহিলা সংস্করণ হয়ে ওটা ওর পক্ষে শক্ত নয়।

বাপ-মা বাধা দিতে কসুর করেননি। এমন কি নবীনাকে রাগিয়ে কাজ হাসিল করবার আশায় বলেছিলেন—আর কত পারব আমরা? আবারও যদি তোমার পড়ার খরচ চালাতে হয়—

নবীনা কিন্তু ওঁদের কাজ হাসিল করতে দেয়নি, রেগে উঠে বলেনি—ঠিক আছে পড়বো না।—

নবীনা হেসে বলেছিল—মনে করো আগাম দাদন দিচ্ছো, পরে সুদে-আসলে শোধ পাবে।

দরকার নেই আমাদের ধার দেওয়ায় আর শোধ নেওয়ায়।

বেশ তাহলে উপহারই দাও। আমার বিয়েতে তো অনেক হাজার টাকা খরচা করবে ঠিক করেছিলে, তার কিছু অংশ এই বাবদ খরচা করো। ভবিষ্যতে যে তোমাদের কতো সুবিধে হবে এখন অনুধাবন করতে পারছ না, পরে বুঝবে। যতোদিন ইচ্ছে মামলা-মকদ্দমা চালাও। উকিলের ফী লাগবে না।

মা রেগে বলেছিলেন—মামলা শত্রুর হোক।

নবীনা হেসে বলেছিলো—আহা, শত্রুরই তো হবে। তা একহাতে তো তালি বাজে না? তালির তালটা তো দিয়ে যেতে হবে?

মা-বাপ হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন।

ক্রমশঃ আবার মেয়ের গৌরবে গৌরবান্বিতও হতে শুরু করেছেন। সমাজের চেহারা এতো দ্রুত পালটাচ্ছে যে, ক্রমেই অনুভব করছেন ওঁরা 'মেয়ে বিয়ে হয়ে ওমুক জায়গায় শ্বশুর বাড়ি চলে গেছে—। বলার থেকে অনেক বেশী সম্ভ্রমের—মেয়ে এম-এ পাশ করে ল পড়ছে—তথা মেয়ে ল পাশ করে বেরিয়ে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করছে।'

নবীনার প্রবীণা নাম ঘুচিয়ে ছেড়েছে নবীনা। সবকটা মেয়ের মধ্যে নবীনাই তার ভবিষ্যৎ চিন্তায় নতুনত্ব এনেছে।

নইলে আর সবই তো গতানুগতিক।

জয়তী একটা মাঝারি গোছের স্কুলের দিদিমণি হয়ে বসে এক মাঝারি কলেজের বাংলার লেকচারারের সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করেছে।

নয়না-দীপকের ব্যাপারটাও বলতে গেলে সাধারণই। ওদের বিয়েটা যে অবধারিত, ওদের ভবিষ্যৎটা যে একই সুতোয় গাঁথা হয়ে গেছে, এটা পরিচিতজনেরা সকলেই মেনে নিয়েছে এবং ওদের দুটো পরিবারই মেনে নিয়েছে। অথবা মেনে নিতে বাধ্য

হয়েছে। এখন শুধু দীপকের আয়টা আর একটু ভদ্র মতো হবার অপেক্ষা। আশা হচ্ছে হবে শীগগিরের মধ্যে।

আর নয়নাও তার রিসার্চটা শেষ করে ফেলবার চেষ্টা করছে এই অবকাশে। তার গবেষণার বিষয় হচ্ছে—ভারতীয় সমাজ-বিজ্ঞানে শ্রেণীভেদ।

বিধুশেখর নাতনীকে এই বিষয়ে প্ররোচিত করেছিলেন।

পত্রলেখা বলেছিলো—এই তো এতোদিন ধরে পড়াশুনো শেষ করলো বাবা, আবার পড়া ধরাচ্ছেন আপনি ওকে?

বিধুশেখর হেসে বলেছিলেন—পড়াশোনার কি আর শেষ আছে মা?

তা ছেলেমানুষ অতো কঠিন বিষয়টা নিয়েই বা কেন? ও তো বলছিলো রবীন্দ্রনাথের ওপর কিছু কাজ করবার ইচ্ছে ছিলো—।

আযৌবন বাপের কাছে থেকে আর নয়নার ব্যাপারে প্রতিটি বিষয়ে খোঁজ নিতে নিতে পত্রলেখাও ক্রমশঃ বিদুষী হয়ে উঠেছে। অনেক কিছুই এখন তার বোধগম্য হয়।

নয়নার তাড়নাতেই হয় আরো।

যেই পত্রলেখা বলে—থাক বাবা, ওসব আমি বুঝি-টুঝি না। ও আমার মাথায় ঢোকে না।

অমনি নয়না তর্কে নামে—কেন মাথায় ঢোকে না, কেন বোঝো-টোঝো না? আসলে তো বাপু বোকা নও। সংসারের কূটকচালের জিনিসগুলো তো বেশ বুঝতে পারো? এসবও বোঝবার চেষ্টা করো।

মাসির সঙ্গে নয়নার সম্পর্কটা খুব মধুর। গুরুজন যদি বন্ধুজন হয় তাহলে সম্পর্কের মধ্যে যে মাধুর্য এসে ধরা দেয় সেইটা আছে ওদের মধ্যে।

নয়নার মা মহাশ্বেতা যেমন সব বিষয়েই সীরিয়াস পত্রলেখা তেমন নয়। পত্রলেখার মধ্যে ক্ষমা আছে। পত্রলেখার মধ্যে নিজের সম্পর্কে মূল্যবোধের বালাই নেই। মহাশ্বেতার মতো পিতৃ-

গরবে গরবিনীও নয় সে। জীবনটা তার কাছে যেন শুধুই কতক-গুলো দিনরাত্রির সমষ্টি। দিনটার ওপর কাজের বোঝা চাপিয়ে শেষ করে ফেলতে পারলেই নিশ্চিন্দি। রাত্রিটা শেষ করে দেবার ভার তো ঘুম নামক সর্বসন্তাপহারিণীই নিয়ে রেখেছেন। এক ঘুমে রাত কাবার হয়নি এমন রাত পত্রলেখার বিরল। কারো অসুখে-বিসুখে রাত জাগতে বসলে আলাদা, সে তো জাগতেই বসা।

শুধু নয়না যেদিন দীপককে সঙ্গে নিয়ে এসে দেখিয়ে হেসে হেসে বলেছিল—মাসিমণি, চিনে রাখো, সেদিন পত্রলেখার ঘুম আসতে একটু দেরী হয়েছিল। অনেকক্ষণ ওঠা-বসা করে হঠাৎ নয়নার ঘুম ভাঙ্গিয়ে ফেলে প্রশ্ন করেছিল—আচ্ছা ছেলেটার সব জানিস তুই?

সব মানে? এতোদিন একসঙ্গে পড়লাম।

সে সবের কথা বলছি না নয়না, বলছি ওর ঘরবাড়ি, আত্মীয়-সংসার। ওর স্বভাব-চরিত্র, মন-মেজাজ।

নয়না হেসে ফেলে বলে—তুমি যে রেটে প্রত্যাশা করছো ততোটা বোধহয় জানি না। কিন্তু মাসিমণি, অতোটা জানবার জন্যে বোধ-হয় সঙ্গে নিয়ে ঘরকন্না করার দরকার। কিন্তু তাই কি জানা যায়? তুমিই বলো?…মন জিনিসটা অন্তহীন, যার মন সে নিজেই জানে না মেজাজ বস্তুটা হচ্ছে মুহূর্তে পরিবর্তনশীল। খুব শান্ত মেজাজের লোকও হঠাৎ একখানা খুন করে ফেলতে পারে। স্বভাবও তাই। কে বলতে পারে কখন কি অভাব ঘটতে পারে? আর অভাবেই তো স্বভাব নষ্ট। একটা জিনিস রইলো সেটা হচ্ছে চরিত্র। তা যতদূর জানি ওটা বোধহয় এখনো পর্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই। আমাকে ভিন্ন আর কোনো মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখেছে এমন কথা শুনিনি। তবে ভবিষ্যতে কী হবে না হবে কে বলতে পারে?

এখন ওর ঘরবাড়ি আত্মীয়স্বজন কেমন? তাহলে শোনো —ঘরবাড়ি বলতে ওর ঠাকুর্দার আমলের মস্তবড় একটা বাড়ি আছে। বাড়ি মানে অট্টালিকা বললেই হয়। তবে আর কি, পিতামহের

আমল থেকে ভোগই হচ্ছে। তাতে নতুন কিছু যোগ হয়নি। আর বাড়িও যেমন আছে, থাকবার লোকও আছে। শুনেছি তিনটে তলা মিলিয়ে নাকি বাইশখানা ঘর, তাতেও লোক ধরে না।

পত্রলেখা হাঁসফাঁস করে বলে—ঠিক আমার শ্বশুরবাড়ির মতন। তুই পারবি অতবড়ো সংসারের মধ্যে গুঁজে থাকতে?

নয়না হেসে বলেছিল—পারা না পারা তো নিজের হাতে। পারবো ভাবলেই পারা যায়, পারবো না ভাবলে পারা যায় না।

কি জানি। আমার ভয় ভয় করছে।

বেশী জেনে কি লাভ মাসিমণি? তোমরা যদি ঘটক-ফটক লাগিয়ে একখানা রাজপুত্তুর এনে আমার বিয়ে লাগিয়ে দিতে তাহলেই কি তুমি এর বেশী কিছু জানতে পারতে?

পত্রলেখা আস্তে বলেছিল—তার মধ্যে একটা সান্ত্বনা ভাগ্য আমায় এই দিয়েছে—আর না হয়তো অন্য জনেরা আমার ওপর এই চাপিয়েছে—কিন্তু এতে তো সে সান্ত্বনা-স্বস্তি নেই। সব সময় তো তোকে বুঝতে হবে—এটা আমি নিজে করেছি—

নয়না হেসে ফেলে বলে—হাড়ে হাড়ে বুঝতে হবে। কী বলো? যাক গে, যা হবার হয়েছে। ও নিয়ে আর ঘুম নষ্ট কোরো না মাসিমণি, তোমার এতো সাধের সাধা ঘুম।

আজ কেমন ঘুম আসছে না।

নয়না বলে—না আসাই স্বাভাবিক। মনের মধ্যে যন্ত্রণা, আমার জিনিসটা আর একজন নিয়ে নিয়েছে—

পত্রলেখা হেসে ফেলে বলে—তাতে কি আর যন্ত্রণা? সেটাই তো প্রার্থনা। মা মাসি তো তাই চায়।

ছাই চায়। আমার মা বুঝি তাই চাইবেন? তিনি যে কোন্ আলোয় নেবেন তাঁর ভাবী জামাইকে, সেটা বুঝতে পারছি না বলে বলতে যেতেও পারছি না। মহিলাটি যে একটা গোলমেলে। আমার বাবা আমায় একটু অধিক ভালবাসতো। তাতেই তো রীতিমতো হিংসেয় ফেটে যেতেন ভদ্রমহিলা।

আঃ নয়না, কী যে বলিস। কিছু কি তোর মুখে আটকায় না?

তোমার সামনে আটকায় না। মায়ের শৈশবকাল থেকে নয়নাকে নয়ন-ছাড়া করবার সদিচ্ছা ওই যন্ত্রণা থেকেই।

ওকথা বলিস না নয়না, তোর মা তোর ভালোর জন্যেই—।

আহা, সেকথা কি আমি অস্বীকার করছি? ভালোর জন্যেই। মানে নিজেকেও প্রাণপণে সেটাই বুঝিয়েছিলেন তো—।

আমার বাবার কাছে মানুষ হয়ে কি তোর ভালো হয়নি নয়না?

একশোবার। হাজারবার। তবে আমার বাবার কাছে মানুষ হলেও যে খারাপ হতো তা আমি মনে করি না। হয়তো ঠিক এরকমটি হতাম না, অন্য ছাঁচের হতাম—অন্যভাবের। তবু খারাপ কিছু হতাম না, এ বিশ্বাস রাখি। লোকটা আর যাই হোক খাঁটি ছিলো।

পত্রলেখা নিশ্বাস ফেলে বলে—কদিনই-বা তোর নিজের বাবার হাতের গড়ন পেতিস। পত্রলেখা চুপ করে যায়।

নয়নাও চুপ করে যায়।

হঠাৎ একটা প্রাণখোলা হাসির শব্দ শুনতে পায় যেন।

পত্রলেখা একটু পরে বলে—আমায় বললি অথচ তোর মাকে বললি না, এতে মা দুঃখ পাবে। তাড়াতাড়ি বলিস।

নয়না একটু কঠিন হাসি হেসে বলে—মা রইলেন অথচ একটা ছোট্ট শিশু মাসির কাছে মানুষ হলো, এর মধ্যেও দুঃখ পাবার প্রশ্ন ছিলো মাসিমণি।

পত্রলেখা বিষণ্ণ গলায় বলে—তা সত্যি। যতই যা হোক দুধের সাধ কি আর ঘোলে মেটে?

ওকথা বলছি না মাসিমণি, দুধের বদলে ক্ষীরই পেয়েছিলাম, কিন্তু কথা তো তা নয়। যেটা প্রাপ্য পাওনা সেটা না পেলেই একটা প্রশ্ন ওঠে।

তা হোক, তোর কাজ তুই করিস।

বলবো। যাবো একদিন সময় করে—

কথাটা সত্যি। সময় করেই যেতে হবে।

মহাশ্বেতা তার সংসারের পাট চুকিয়ে দিয়ে বড় বোনের মতো বাপের সংসারে এসে পড়েনি। মহাশ্বেতা উত্তরপাড়ায় তার শ্বশুর-বাড়িতে গিয়ে ঠেলে উঠেছে।

কারণ?

কারণ দখল রাখা। শ্বশুরের ভিটেয় দখল রাখা। চিরদিন ওই মস্ত বাড়িটা ভাওররাই ভোগ করে আসছে। তবে তখন তো মহাশ্বেতার মনের মধ্যে অনিশ্চয়তা, অনিরাপত্তার ভাব দানা বাঁধেনি। যার বাড়ি তারই থাকবে, যখন রিটায়ার করবে বাড়িতে গিয়েই বসবে। আর যদি তার মধ্যে কলকাতায় বদলী হয়ে আসে তো তার চেয়ে ভালো আর কী আছে? কিন্তু হঠাৎ জীবনের চেহারাটা গেল বদলে, এখন ভয় সন্দেহ আশঙ্কা। এখন অনিশ্চয়তা।

অতএব মূল কেন্দ্রে গিয়ে চেপে বসে থাকাই ভালো।

নয়না বলেছিল—আচ্ছা মা, সেখানে তো তোমার দখলে এক-খানাই মাত্র ঘর? সে তো তুমি এখানেই পেতে? এখানে দু'দুটো ঘর খালি পড়ে আছে।

মহাশ্বেতা রেগে বলছিলো—সেটা আর এটা এক হলো? সেখানে আমার অধিকার।

এখানেও তা আছে। তোমাদের তো ভাই নেই।

বাপের বাড়ির ভাগ আর শ্বশুর বাড়ির ভাগে অনেক তফাৎ।

নয়না হেসে উঠে বলেছে—আমি তো কিছুই তফাৎ দেখি না। শেষপর্যন্ত তো সাড়ে তিন হাত দেহখানার জন্যে হাত চারেক লম্বা বিছানাটা পাতার মতো একটু জায়গার প্রশ্ন।

মহাশ্বেতা রেগে বলেছে—ঠিক বাপের মতন আলগা কথা। তোর বাপের বিষয়ের তোর ভাগটুকু যাতে বেদখল না হয়ে যায় সেটুকু আমায় দেখতে হবে না?

নয়না অবাক হয়ে বলেছিল—আমি ওইখানে গিয়ে বাস করবো নাকি?

বাস না করলেই-বা, তোর বলে একটা ঘর থাকবে। সাজানো গোছানো চাবি দেওয়া। কখনো যদি ইচ্ছে হয়—।

নয়না নিশ্বাস ফেলে বলে—কখনো যদি ইচ্ছে হয়? সেইটুকুর জন্যে তুমি আমার কাছে না থেকে একা বসে সেই ঘর পাহারা দেবে?

মহাশ্বেতাও তখন নিশ্বাস ফেলে বলেছে—তোর কাছে আর আমি কবেই-বা থাকলাম?

এখন থাকতে পারতে।

নির্বোধ মহাশ্বেতা তখন অসতর্কে অথবা নিজেরই অজানিতে বলে ফেলেছিল আর একটা কথা। হয়তো সেইটাই আসল কথা।

বাবার এখানে বারোমাস থাকা? বাব্বা, ভাবলে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। এতো ধরাবাঁধা! একটু জোরে হেসে ফেললেও মনে হয় বুঝি দোষ হলো।

কী আশ্চর্য! কই আমার তো হয় না।

তোমার কেন হতে যাবে? বাবার কাছে বিধবার যা আদর্শ তার মতন হওয়া সহজ নয়।

অতএব যেটা সহজ সেটাই করছে মহাশ্বেতা।

জা-ভাশুরদের সঙ্গে রাতদিন অধিকারের লড়াই নিয়ে আর ছোট-খাটো ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া-কোঁদল করছে।

আসলে মহাশ্বেতার সর্বদাই একটি প্রতিপক্ষের দরকার। বিধু-শেখরের সংসারে সে জিনিসটার অভাব।

দীপককে নিয়ে যেদিন পত্রলেখাকে দেখিয়েছিলো নয়না সেদিন বিধুশেখর বাড়ি ছিলেন না। বিশেষ এক পণ্ডিত সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন কাটোয়ায়। অতএব নির্ভয়ে এনেছিলো।

কিন্তু বিধুশেখরকে না জানালে তো আর চলবে না? জানাতে হবে, অনুমতি নিতে হবে।

তবে বিধুশেখরের কাছে তো আর হঠাৎ আসামীকে ধরে এনে সামনে ফেলে দেওয়া যায় না? তার জন্যে প্রস্তুতি চাই, পরিবেশ সৃষ্টি করা চাই। উপস্থাপনার জন্য লগ্ন নির্ণয় করা চাই।

কাজটা দুরূহ।

অথচ বিধুশেখর রুক্ষ প্রকৃতির নয়, কড়া মেজাজের নয়, হৃদয়হীন নয়, মমতা বর্জিত নয়। আর নয়নার কাছে তো কোনো কিছুই নয়।

তবু নয়নার মনের মধ্যে কতোদিন ধরে চলেছিলো আয়োজন। যেটা দেখে দীপক বলেছিল—উঃ! ওই ভয়ঙ্কর মানুষটির কাছে জীবন কাটাতে হয়েছে তোমাকে, ভেবে দুঃখ হয়।

নয়না তার বিখ্যাত নয়ন দুটি তুলে বলেছিল—নাঃ, তুমি আর আজ পর্যন্ত দাদুকে বুঝে উঠতে পারলে না। না দেখলে বোধহয় পারবেও না। মোটেই উনি ভয়ঙ্কর নয়, খুবই স্নেহশীল।

স্নেহশীল কিন্তু এটা নিশ্চিত প্রশ্রয়শীল নয়।

নয়না রেগে উঠে বলেছিল—প্রশ্রয়শীল কেন হতে যাবেন? ছেলে-মেয়েদের যে কোনো খেয়াল প্রশ্রয় দিতে না পারলেই বুঝি 'ভয়ঙ্কর' বলতে হবে?

দীপক ওর রাগটাকে উপভোগ করতে ভালবাসে যেন। দীপক ওকে রাগাতেই চেষ্টা করে। তাই ওর কথায় গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে —ওঃ খেয়াল! মিস নয়না গোস্বামী, আমাদের জীবনের এই পরম বস্তুটাকে যদি আপনি খেয়াল মাত্র মনে করে রেখে থাকেন তাহলে দীপক ঘোষালকে কেটে পড়তে দিন।

নয়নার কালো চোখে বিদ্যুৎ খেলে যায়—দীপক তোমার এই মেয়েলী মান-অভিমানের বহর দেখে মাঝে মাঝেই ভাবনা হয় তোমায় নিয়ে ঘর করা যাবে কিনা। আচ্ছা এতো ন্যাকা হচ্ছো কেন দিন দিন?

দীপকের ইচ্ছে হয় এক্ষুনি ওই তাজা চকচকে কোমল পুঁই ডগার মতো মেয়েটাকে নিজের আয়ত্তে এনে ফেলে যা ইচ্ছে করে নেয়। কিন্তু ধৈর্যের শিক্ষা সে নিজেই দিচ্ছে।

নয়না তো যখন-তখনই বলে—আচ্ছা হলেই-বা বড় সংসার। সেটা কি সংসারের পক্ষে এতোই ডিসকোয়ালিফিকেশন যে, কোনো নতুন বৌ তার চৌকাঠ ডিঙোবে না?

দীপকই বলেছে—ও সব তর্কাতর্কির মধ্যে আমি নেই। আমার সাধের নতুন বৌকে ওই বৃহৎ পুরীর মধ্যে কোনো একখানে চালান করে দিয়ে নিজে সর্বদা বিরহীর ভূমিকায় ঘুরে বেড়াবো, আর কোনো এক সময় বৌকে একটু পেলেই ধন্য হয়ে যাবো, এটা কোনো কাজের কথাই নয়।

নয়না ক্ষুণ্ণ গলায় বলে—কিন্তু এভাবে আর কতদিন শুধু একসঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েই চালাবো? কবে তোমার আয় বাড়বে তবে তুমি ফ্ল্যাট ভাড়া করবে, তারপর তুমি সেই ফ্ল্যাটকে শৌখিন ছাঁদে সাজাবে, সেই আশায় দিন গুনতে গুনতে তো বুড়ো হয়ে যাবো।

দীপক বলেছিলো—অপেক্ষার মধ্যেই তো মিলন সুখ। আশাটাই তো পাওয়ার আস্বাদ।

কবিদের হাতে অনেক হাতিয়ার! কত সহজেই তারা হয়কে নয়, আর নয়কে হয় করে ফেলতে পারে, আমি অতো কথার ধার ধারি না। সোজা কথা আমার আর এভাবে কাটাতে ভালো লাগছে না, আমার মতে ভালো দেখাচ্ছেও না।

ভালো দেখানোর প্রশ্নে দীপক হেসে উঠেছিল। বলেছিল—সেই দেখানোটা কাদের কাছে? দর্শকদের কি এসব গা সহা হয়ে যায়নি, অহরহ দেখতে দেখতে? রত্না-শান্তনুকেও দেখছে তারা।

দীপকের এই হাসির মানে আছে। রত্না আর শান্তনু ওই দুটো ছেলে-মেয়ে নিজেদের জীবন দুটো যে কী গোলমেলেই করে রেখেছে!

ওরা যে সম্পর্কে ভাই-বোন এটাকে ওরা অস্বীকার করে না এবং সেই সম্পর্কের পবিত্রতাও সনিষ্ঠচিত্তে রক্ষা করে আসছে। কিন্তু দুজনেই ওরা বিয়ে করেনি আর ঘোষণা করে রেখেছে—করবেও না।

অভিভাবকদের ক্রুদ্ধ প্রশ্নের উত্তরে প্রতি-প্রশ্ন করেছে—পৃথিবীতে সবাই যথা-নিয়মে যথা-সময়ে যথা-পদ্ধতিতে বিয়ে করে কি না, এর ব্যতিক্রম নেই কি না। চিরকুমারী অথবা চিরকুমার নারী-পুরুষ তাঁরা দেখেননি কখনো?

বলেছে অবশ্য আলাদা আলাদা দুজনে দু-বাড়িতে, কিন্তু আশ্চর্য, ভাষাটা ভঙ্গীটা প্রায় এক।

কাজেই ক্রুদ্ধ হওয়ার ভঙ্গীটাও দু'পক্ষের অভিভাবকের একই। হওয়া স্বাভাবিকও, ও বাড়ির কর্তা আর এ বাড়ির গিন্নী দুজনে তো সহোদর ভাই-বোন। একজনের পাড়ায় অপরজন এসে বাড়ি বানিয়ে বসত শুরু করেছিল তো আহ্লাদে আনন্দে উৎসাহে উল্লসিত হয়ে।

ব্যবহার মাধুর্যে দুটো বাড়ি একই হয়ে উঠেছিল। ভাইয়ের বাড়ির কাছে বাড়ি বানিয়ে বসত করতে এলে কোন্ মহিলাই-বা তা না করে তোলেন?

কিন্তু এখন ওই ছেলে-মেয়ে দুটোর গোলমেলে ব্যবহারে ওই একের মাঝখানে ফাটল ধরিয়ে দিয়ে যেন দ্বিধাবিভক্ত করে দিচ্ছে।

ছেলে-মেয়ে দুটোর, বিদঘুটে মতিগতির জন্যে এ বাড়ি ও বাড়িকে এবং ও বাড়ি এ বাড়িকে দোষারোপ করে। সময়ে শাসন না করা অথবা নিশ্চিন্দি হয়ে চোখ বুঁজে থাকাই যে এর কারণ, সে কথা পরস্পর পরস্পরকে শোনাতে ছাড়ে না।

গায়ের জ্বালা বেশী বাড়লেই শান্তনুর মা ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে তাজকে যাচ্ছেতাই শুনিয়ে আসেন এবং ভাইকে প্রশ্নবাণে ক্ষত-বিক্ষত করে আসেন, ওদিকে ভাইও অগ্রাহ্যভরে দিদিকে শুনিয়ে দেয়—শুধু মেয়েই নয়, ছেলেকেও সামলাতে হয়, সভ্য সমাজের রীতিনীতি শিক্ষা দিতে হয় এবং ওদুটোয় মুখ দেখাদেখি বন্ধের কোনো উপায় আবিষ্কার করা সম্ভব কিনা সেটা চিন্তা করে দেখতে বলে।

কাজ কিছুই হয় না।

ওই ছেলে-মেয়ে দুটোর চৈতন্য হয় না। ওরা যে করেই হোক একত্রিত হয় আর দুই ছেলে-বন্ধুর মতো প্রায় সর্বদাই একত্রে ঘোরে, একসঙ্গে বেড়াতে যায়, দোকানে যায় সিনেমায় যায় থিয়েটার দেখতে যায়।

মানে নতুন কিছুই করে না, চিরদিন যা করে এসেছে তাই করে।

যখন ওপরওলাদের টনক নড়েনি তখন তো কোনো বাধাও আসেনি। সেই অবাধ অভ্যাসটা যাবে কোথাও?

যায় না।

যাওয়াবেই-বা কেন?

ওরা তো জানে ওরা খারাপ নয়, নোংরা নয়, অবৈধ সম্পর্কের শিকার নয়। ওরা তাই ওই টনক নড়াদের অগ্রাহ্য করে। তাছাড়া ওঁদের মুখাপেক্ষী তো নয়;—দুজনেই তো রোজগারপাতি করছে। রত্নার যদি মার্কেটে যাবার দরকার হয়, যদি ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে যাবার দরকার হয়, যদি চশমার পাওয়ার বদলাতে কি চশমার ফ্রেম পাল্টাতে, ব্যাঙ্কে চেক জমা দিতে কি টাকা তুলতে অথবা ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে ইচ্ছে হয়, শান্তনুকে না ডাকলে চলে? কী করে সুশৃঙ্খলে হবে, একজন ছেলে সঙ্গী ব্যতীত? আজকাল অবশ্য মেয়েরা পারে না এমন কাজ নেই, কিন্তু ছেলে একটা সঙ্গে থাকা তো দরকার। মহিলা সমিতিতেও কাজ করবার জন্যে দুটো ছেলে লাগে।

এ-ছাড়া লোভনীয় দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য বস্তুগুলি কে এনে দেবে রত্নাকে? শান্তনু ভিন্ন? বাবা দেবে?

ছেলেবেলায় টফি লজেন্স শ্লেটপেন্সিল রবার উডপেন্সিল দিয়ে শুরু—এখনও চলছে তাই, মাত্র এক বছরের বড় দাদাকে রত্না 'দাদা' বলে না, নামকরেই ডাকে। কিন্তু শান্তনু নামের ছেলেটা যেন মনের মধ্যে একটি বিজ্ঞ অভিভাবকের ভূমিকাটিকেই লালন করে আসছে।

যেন আমি না করলে কে করে দেবে ওকে? অর্থাৎ রত্নার দায়িত্ব যেন শান্তনুরই।

তবে রত্নাই কি অকৃতজ্ঞ?

শান্তনুর যে সমস্ত কাজ একদা রত্না বাল্যে কৈশোরে স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিয়েছিল সেগুলো সে সযত্নে বহন করেই আসছে।

শান্তনুর জামার বোতাম ছিঁড়ে গেলে, শান্তনুর মোজায় রিপু করতে হলে, শান্তনুর বইপত্তর বেশী অগোছালো হয়ে গেলে সবকিছু ঠিকঠাক করবার দায়িত্ব আর কার? রত্না ছাড়া?

রত্নার মা যদি রেগে রেগে বলে—কার মোজা রিপু হচ্ছে শুনি? কার?

রত্না কিছুমাত্র দ্বিধা না করে বলে—কার আবার? দেখতেই পাচ্ছো শান্তনুর। এ-রকম মোজা বাবা পরে?

পরের পায়ের মোজা কুড়িয়ে এনে সেলাই করতে লজ্জা করে না তোর?

রত্না অবলীলায় বলে—তোমাদের হঠাৎ ভূতে পেয়েছে তাই হঠাৎ শান্তনু পরমার্কা হয়ে গেল। আমায় তো পায়নি, তাই লজ্জা করে না।

কই বাপের একটা কাজ তো করতে দেখি না?

দেখতে চাও না বলেই দেখতে পাও না। তাছাড়া আমার বাবা স্বাবলম্বী। কারুর কিছু করে দেওয়ার ধার ধারে? বাবার ভাগ্নেটি মাতুলক্রম হলে তো কোনো কথাই ছিল না। হয়েছে কই? তার ওপর আবার আমার পিসিটি হয়েছেন গুণের গুণনিধি। একটা কাজে যদি লাগে। পারে গাদাগাদা রান্না করতে আর সেগুলো ছেলের পেটে চালান করবার তাল করতে।

এই সপ্রতিভতা যে সম্পূর্ণ অভিনয়, পুরোদস্তুর চালাকি, ষোলো আনা ঢং এ আর বুঝতে বাকি থাকে না রত্নার মার। কিন্তু উপায় কী? কীল খেয়ে কীল চুরি ছাড়া আর কী করবার আছে, দুর্ধর্ষ মেয়ের মায়ের? ধরে মারবার বয়েস নেই, তাড়িয়ে দেবার উপায় নেই, মুখ দেখবো না বলার সুবিধে নেই।

একটা কিছু করতে গেলেই যদি গেরো ফস্কে হাতছাড়া হয়ে যায়। যা করছে, তবু একটা সীমার মধ্যে, একটা আবরণের মধ্যে, আবরণ ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়লে? সীমার বাইরে দৌড় দিলে?

তখন কী করবেন তিনি?

অতএব শুধু তলে তলে মেয়েকে ধিক্কার, শুধু তলে তলে ননদিনীর সঙ্গে বিচ্ছেদ। এবং কানে সীসের ছিপি পরে বসে থাকা। ওই ছিপিটা না পরলেই তো কানে আসবে—'এখনো বিয়ে হয়নি তো মেয়ের? সেই তুতো ভাইটাকে ল্যাংবোট করে ঘুরে বেড়াচ্ছে?'

তবে শান্তনুর মা ছেলের মা বলেই যে রাজ্যপদ পেয়েছে তা নয়। তার কানেও এসে পৌঁছয়—'ও ছেলের আর বিয়ে হয়েছে, ওই তুতো বোনটিই চিরকাল ছিনে জোঁকের মতন ঘাড়ে চেপে বসে থাকবেন।'

এদের কথাটথা নিয়ে যদি দীপক হাসে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু দীপকের হাসি নয়নাকে দমাতে পারে না। নয়নার মতে যে যা করে করুক, নিজেদের চেহারাটা সমালোচ্য না হলেই হলো।

বেশ, 'ভালো না দেখানো' কথাটা প্রত্যাহার করে নিচ্ছে নয়না, 'ভালো লাগছে না' সেটাই থাক।

ভালো লাগছে না এইভাবে দূরে দূরে থাকতে।

এর একটা বিহিত করতেই পত্রলেখার কাছে দীপককে দেখাতে আসার পরিকল্পনা।

একেবারে পত্রলেখার সামনে এনে ধরে দিয়ে বলা—এই যে মাসিমণি, এই হচ্ছে সেই তোমার বহু পরিচিত অথচ অদেখা দীপক ঘোষাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন, খেলাধূলায় নামকরা, কবিতা-টবিতা লেখে, ইত্যাদি ইত্যাদি।···আর দীপক, ইনিই হচ্ছেন আমার সেই বিখ্যাত মাসিমা শ্রীমতী পত্রলেখা দেবী।

ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা, তসরের থান পরা এই আধাবয়সী বিধবা মহিলাটির নাম পত্রলেখা শুনে প্রায় চমকে যায় দীপক, এবং তারপরই মনে মনে হেসে ভাবে বাহারি নামের বাড়ি।

তবে হ্যাঁ এই দীপ্ত মূর্তি দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী মহিলাটিকে দেখে নেহাৎ বিধবা-বুড়ি বলে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। দেখলেই সমীহ আসে।

পত্রলেখা হেসে বললে—আমি আবার বিখ্যাত হলাম কী গুণে?

বাঃ, আমার মাসিমা এটাইতো যথেষ্ট গুণ।—বললো নয়না।

পত্রলেখা বললে—তাহলে মানতেই হবে বিখ্যাত।

তারপর পত্রলেখা টুকটাক প্রশ্ন করলো দীপককে, বাড়ি কোথায়, বাড়িতে কে কে আছেন, কটি ভাই-বোন ইত্যাদি।

তারপর বললো—বোস তোমরা, আমি চায়ের কথা বলিগে—

পত্রলেখা উঠে যেতে দীপক বললো—উঃ, কনে দেখার কালে

মেয়েদের কী অবস্থা হয় অনুধাবন করছি। অন্তঃসলিলা ঘামে গেঞ্জি-কেঞ্জি সব ভিজে ওয়ার।

নয়না হেসে ওঠে—এতেই এই? ওই নিরীহ ভদ্রমহিলার কয়েকটি সহজ-সরল স্বাভাবিক প্রশ্নে? তাহলে ওনার বাবার আসরে যখন ইণ্টারভ্যু দিতে হবে?

কী জানি। বোধহয় পেরে উঠবো না। ওটা তুমিই ম্যানেজ করে নিতে পারবে না?

একা আমি? কার হাতে এই মহা-মূল্যবান রত্নটিকে উৎসর্গ করবেন বিধুশেখর ভট্টাচার্য? তাঁকে তাহলে তোমায় চেনাতে পারিনি এতোদিনে।

দীপক বলে—আমার তো ভেবেই হৃৎকম্প হচ্ছে।

নয়না তার কুরঙ্গ নয়ন কপালে তুলে বলে—আহা, আর আমি যখন তোমাদের বাড়ি যাবো?

দীপক গভীর গলায় বলে—আমি বলি কি নয়না, তোমার আর গিয়ে কাজ নেই। ও যা হবে একেবারেই হবে।

নয়না বলে ওঠে—বারে! একেবারে সেকালের মেয়েদের মতো ঘোমটায় মুখ ঢেকে একেবারে দুধে-আলতার পাথরে গিয়ে দাঁড়াবো না কী? শ্বশুরবাড়িটা কেমন, সেখানের লোকটোকেরা কেমন আগে একটু দেখে নেব না?

আর দেখে যদি অপছন্দ হয়?

হলেই হলো? পছন্দটা তো নিজের হাতে।

আমার তো নিজের বাড়িরই অনেককে পছন্দ হয় না।—স্পষ্টই বলে দীপক।

নয়না হেসে ফেলে বলে—ওটা কোনো কোনো ছেলের একটা স্বাভাবিক গুণ। এইসব ছেলেদের কী বলে জানো? ঘর জ্বালানে, পর ভোলানে।

দীপক মৃদু হেসে বলে—কী বললে? পর ভোলানে? ঠিক তো? যাক ওতেই হবে। আর কিছু না হলেও চলবে।

এমা, দীপক। কী চালু ছেলেরে বাবা। যে কোনো কথার মধ্যে থেকে নিজের দরকারী কথাটি ঠিক বার করে নেবে।

দীপক নয়নার পাতলা লম্বা দেহখানির নিটোল গঠনভঙ্গীর দিকে একটু মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলে ওঠে—বলেছো ঠিকই, আর এভাবে থাকতে ভালো লাগছে না।

হঠাৎ?

হঠাৎই মনে হলো রে নয়না।

পাঠ্যাবস্থায় ওরা একটি অলিখিত চুক্তিতে সবাই সবাইকে 'তুই' করে কথা বলতো, দীপক আর নয়নাও। এখন কেন কে জানে, 'তুই'টা ধূসর হয়ে গেছে, 'তুমি'টাই মুখে এসে যায়। অনেকদিন পরে ডেকে ফেললো দীপক সেই পুরনো ভঙ্গীতে।

নয়নার চোখে ঘোর লাগে—নয়না গভীর গলায় বলে—এই দীপক! আমায় আর 'তুই' বলিস না কেন রে?

এই তো বললাম।

সব সময় বলবি।

ভবিষ্যতেও সেটাই চালাবো বলছিস?

না হয় চালালি? কী হয় তাতে?

হয় না কিছু। গ্রামীণ সারল্যের খাঁটি ভাবটা প্রকাশ পায়, এই আর কি।

এই সময় পত্রলেখার গলার স্বর শুনতে পাওয়া যায়। বোধহয় ছোট যে মেয়েটা বাড়ির কিছু কাজকর্ম করে, তাকে চা নিয়ে আসবার নির্দেশ দিচ্ছে।

দীপক বললো—তোমার এই মাসিমার নাম পত্রলেখা। ভাবতে অবাক লাগছে।

কেন অবাকের কী আছে?

দীপক অপ্রতিভভাবে বলে—না, মানে, এরকম চুলটুল ছাঁটা, থান শাড়ি পরা—

নয়না দীপকের অজ্ঞতায় হেসে ওঠে, বলে—তোমরা ছেলেরা এমন বোকার মতো কথা বলো। থান আবার শাড়ি হলো কী করে? থান মানেই তো সেটা শাড়ি নয়। পাড়ই তো নেই—

দীপক কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে—এরকম কোনো নির্দেশ অভিধানে আছে, যার পাড় নেই, সেটা শাড়ি নয়? শাড়ি মানে হচ্ছে কাপড়, এই তো জানি।

শাড়ি মানেই হচ্ছে কাপড়? চমৎকার। তাহলে ভদ্রব্যক্তিরা পাঞ্জাবীর সঙ্গে যা পরে বেড়ান সেটাও শাড়ি?

দীপক একটু ভেবে নিয়ে হেসে ফেলে বলে—এতো সব বিশদ ব্যাখ্যা মনে থাকে তোমাদের?

থাকতেই হবে।

নয়না দৃঢ়স্বরে বলে—এটা তো একটা তুচ্ছ কথা, তুচ্ছ উদাহরণ। কিন্তু জীবনের সব ক্ষেত্রে, সব সময় মেয়েদেরই তো সব কিছু মনে রাখতে হয় মশাই। ছেলেরা তো সব কিছুই 'অত কী মনে রাখা যায়?' বলে গা ঝেড়ে ফেলে। পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক বিধিনিষেধ, এমন কি আত্মীয়তার সম্পর্ক সূত্রগুলি পর্যন্ত তোমরা ছেলেরা মনে রাখতে রাজী নও। 'তুতো-টুতো' শুনলেই তোমাদের মাথা ধরে ওঠে, অমুকের অমুক শুনলেই তোমাদের ঘাম ছোটে। অথচ মেয়েরা অবলীলায় সমস্ত আত্মীয়কুলের হিসেব রাখে কে কার কী হয় মনে রাখে—

দীপক বলে—মারাত্মক! তুমি পারো?

কেন পারবো না? একবার শুনলেই তো মনে থেকে যায়।

ওইটাই আশ্চর্য। কী করেই যে যায় সেটা। সাংঘাতিক।

ওটা তো আদৌ কোনো শক্ত ব্যাপারই নয় দীপক। আসল কথা হচ্ছে মূল্যবোধ থাকা না থাকা। ওই পারিবারিক বা সামাজিক ব্যাপারগুলো সম্পর্কে মূল্যবোধ থাকলে, তোমাদের পক্ষেও শক্ত হতো না। কিন্তু তোমরা ছেলেরা এগুলোকে কিছুমাত্র মূল্য দাও না—

দীপক এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে—এই নয়না, সিগারেট ধরানো
বে ?

মাথা খারাপ ? যে কোনো মুহূর্তে পত্রলেখা দেবী এসে
বেন না ?

দীপক একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের ভান করে পকেটে ঢোকানো
ত বার করে নিয়ে বলে—এইগুলোই হচ্ছে তোমাদের সভ্যতা,
্যতা, সামাজিকতা, এই তো ? এর সম্বন্ধে তোমাদের এতো
্যবোধ। কিন্তু সত্যিই কি এতোটার কোনো প্রয়োজন আছে ?

তোমার মনে হচ্ছে 'এতোটা', আমার ধারণায় এটুকু ন্যূনতম।

দীপক হতাশের ভঙ্গীতে হাত উল্টে বলে—তবে তাই। তোমার
ণার বশেই যখন বাকি জীবনটা চালাতে হবে।

ভেবে খুব দুঃখ হচ্ছে, কেমন ?

দারুণ !

তোমাকে একদিন মার কাছে নিয়ে যাবো।

তার মানে আর একটি বধ্যভূমিতে—

বধ্যভূমি ? এখানে তোমায় বধ করা হচ্ছে ?

নয়নার স্বর উষ্ণ।

দীপক হেসে ফেলে বলে—আহা, এনাকে তো আমার ভালোই
গ গেছে, বেশ ভালো লেগে গেছে, কিন্তু সেখানে তো এটা নাও
ত পারে ?

না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী—নয়না বলে। তা বলে পশ্চাদপসরণ
তে হবে নাকি ? তোমাদের ছেলেদের তো এই কাণ্ড।
ীয়দের মধ্যে যাকে ভালো লাগবে, তাকেই শুধু মনে রাখবে
। ; অন্য সবাইকে, একই সম্পর্কের কথা অনায়াসে ভুলে যাবে।

আরে নয়না ? এটা যে আমি করি তুমি জানলে কী করে ?

এটা কেবলমাত্র তোমার কথাই নয় বলে। তোমাদের সবাইয়েরই
।। অথচ আমরা মেয়েরা ? টের পেতে দিই ? কাকে ভালো লাগছে,
। কাকে লাগছে না ? সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহারই বজায় রাখি।

দীপক গম্ভীরভাবে বলে—তার মানে তোমরা এক একখানি ঘোরতর ভণ্ড। আমার মতে এই ভণ্ডামীর কোনো মনে হয় না যার সম্পর্কে যা মনোভাব তা স্পষ্ট করেই বলা উচিত।

নয়না শান্ত গলায় বলে—অতো উচিত বোধ প্রকাশ করতে গেলে অরণ্যে বাস করতে হয়। তুমি যেটাকে বলছো ভণ্ডামী, আমি যদি বলি, সেটা মমতা।

মমতা?

নিশ্চয়। মমতাহীন না হলে অতো স্পষ্টবাদী হওয়া যায় না—

তুমি তো তোমার মাকে খুব বলো শুনি—

আরে দূর! সে তো মজা করে। তারও লিমিট থাকে। মেয়েদের মধ্যে এই মমতাটুকু না থাকলে আর ঘর-সাংসার করতে হতো না মানুষের।

কিন্তু তুমি তো বলো তোমার দাদু বলেন, কখনো সত্যভ্রষ্ট হবে না—

মানুষ সম্বন্ধে মমতাশীল হওয়াটা সত্যভ্রষ্ট হওয়া নয় দীপক। শ্রদ্ধা আর মমতা এই দুটো থাকা দরকার বৈকি। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরও কিছু ত্রুটি থাকতে পারে। থাকতে পারে কিছু দুর্বলতা। সেটা স্পষ্ট করে মুখের ওপর বললেই সত্যনিষ্ঠ হওয়া যায় না। নিজের মধ্যে ভেজাল আছে কিনা, ফাঁকি আছে কিনা সেটাই দেখো আগে।

দীপক বলে—আলোচনাটা বড় বেশী গুরুপাক হয়ে যাচ্ছে নয়না। এ সময় চা-টা এসে পড়লে বড় ভালো হতো।

নয়না হেসে ফেলে।

বলে—সত্যি দীপক, তোমার স্বভাবটাও ঠিক আমার বাবারই মতো। ঘোরতর গুরু আলোচনার মধ্যে এমনি একটা কিছু বলে বসতেন। এই যে এসে গেছে তোমাকে গুরুতরর হাত থেকে রক্ষা করতে।

পত্রলেখা এসে ঢোকে। পিছনে একটা পরিষ্কার ফ্রক পরা মেয়ে। পত্রলেখার হাতে জলের গ্লাশ, মেয়েটার হাতে একখানা

ঝকঝকে কাঁসার থালার উপর বসানো চায়ের কাপ, খাবারের প্লেট।

জিনিসগুলোর মাপ সম্পর্কে দীপক আপত্তি জানায়। তুলে নিতে বলে নয়নাকে। শেয়ার করতে বলে এবং কোনো সুবিধে না পেয়ে পত্রলেখার অনুরোধে সব খেয়েও নেয়।

পত্রলেখার কথাবার্তা খুবই সাধারণ, কিন্তু চেহারা ও ভঙ্গীতে এমন একটি আভিজাত্য আছে যে মানুষকে অবহেলা করা যায় না।

পত্রলেখা যখন বলে, 'আবার এসো' তখন যেন আসা সম্পর্কে একটা দায়িত্ব সৃষ্টি হয়। তবে ও কিছু বলার আগে নয়না বলে ওঠে—আসতে তো হবেই। না এসে উপায় কী? ও না আসুক ওর ঘাড় আসবে।

তোর কথা-টথা আর কখনো সভ্য হবে না—বলে পত্রলেখা সস্নেহ হাসি হাসে।

চলো তোমায় বাসে তুলে দিয়ে আসি—বললো নয়না।

দীপক নীচু গলায় বললো—সৌজন্য? ভদ্রতা? না প্রেম?

যা খুশী ভাবতে পারো—বলে নয়না বেরিয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে।

দীপক বললো—তোমার মাসিকে দেখে দাদু সম্পর্কে ভয়টা একটু ভাঙছে—

নয়না বলে—কাউকে দেখেই অপর কারো সম্পর্কে ধারণা করা চলে না।

তার মানে, ভয়ের বাসাকে শক্ত করতে চাইছো?

উঃ বাবা, কিছু চাইছি না। শুধু তোমার ওই টোপর পরাটাকে একটু ত্বরান্বিত করতে চাইছি। এইভাবে শুধু শুধু একটা ছেলের সঙ্গে ঘুরছি। এই ভেবে নিজেকে একটা বাজে মেয়ে মনে হচ্ছে।

নয়নার স্বর গম্ভীর হয়ে আসে, নয়নার কালো চোখে আরো কালো ছায়া নামে।...কিন্তু হঠাৎই নয়না ছেলেমানুষের মতো প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে—আরে আরে, দেখতে পেলে দীপক?

কী দেখতে পাবো?

নয়না বলে—সামনে দিয়ে যে বাসটা চলে গেলো, তার মধ্যে

এদিকে জানালার ধারে ঠিক প্রবীরের মতন একটা ছেলে বসেছিলো, দেখলে না? ইস! এদিকে যদি তাকাতো একবার—

দীপক বলে—না তাকিয়েছে সেটাই ভালো, তাকালেই ঠিক নেমে পড়তো আর নেমেই হাতটা পেতে বলতো, গোটাকতক টাকা দিতে পারিস? অবস্থা ফিরলে শোধ দেব।

নয়না চমকে বলে—তার মানে? বলে এই রকম? এ রকম অবস্থা কবে হলো ওর?

দীপক গম্ভীরভাবে বলে—কেন, ওর খবর কিছু শোননি কারো কাছে? আমার ধারণা তোমার গেজেট জাতীয় বান্ধবীরা কোনো-কালে শুনিয়েছে।

নয়না শুকনো শুকনো মুখে বলে—কিছু কিছু শুনেছি, ও নাকি খারাপ হয়ে গেছে, খুব ড্রিঙ্ক-ফ্রিঙ্ক করে, কিন্তু ঠিক এরকম?

আরো অনেক রকম আছে নয়না, শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। একদিন কসবার ওদিকে আমার এক পিসির বাড়িতে গিয়েছিলাম তার নাতির পৈতেয়। যখন ফিরছি দেখি রাস্তার ধারে একটা জঘন্য চায়ের দোকানের সামনে একটা ফাটা-চটা বেঞ্চের ওপরে বসে কলাইয়ের মগে করে চা খাচ্ছে—

ধ্যাৎ।

নয়না অবিশ্বাসের গলায় বলে—প্রদীপ নোংরা চায়ের দোকানে বসে কলাইকরা মগে চা খাচ্ছে? চোখে দেখলেও বিশ্বাস করবো না।

তাহলে কোরো না। আমারও অবশ্য চট করে নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। আশেপাশে যারা বসে ছিলো তাদের দেখলে, মানে জঘন্য। ও একেবারে উচ্ছন্নে গেছে নয়না, সম্পূর্ণ গোল্লায় গেছে। ওর আর পদার্থ নেই।

কিন্তু কই, বলনি তো কোনোদিন।—নয়না দুঃখের গলায় বলে।

এখনো প্রার্থিত নম্বরের বাসটির দেখা নেই, ওরা কাছেই একটা গাছতলায় দাঁড়িয়েছে কারণ রোদ চড়া হয়ে উঠেছে। নয়নার মুখের

খানিকটায় রোদ খানিকটায় পাতার ছায়া। নয়নার ওই আলোছায়া আঁকা মুখটায় দুঃখ আর করুণা।

দীপক সেদিকে তাকিয়ে গভীর গলায় বলে—যখন তোমার কাছাকাছি থাকি তখন পৃথিবীর আর কারো কথা কি মনে পড়ে? দুর্লভ সময়টুকু অন্য কারো কথায় ব্যয় করতে ইচ্ছে হয়?

নয়না বিষণ্ণ গাঢ় গলায় বলে—কিন্তু ও আমাদের বন্ধু ছিলো দীপক। খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো।

ছিলো, এখন আর নেই।

বন্ধুত্ব কি চলে যাবার জিনিস দীপক?

দীপক আরো গম্ভীর হয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষায় যা বলে তার অর্থ হচ্ছে, বন্ধু যদি ইচ্ছে করে নিজেকে নষ্ট করে ফেলে, যদি পুরানো সংসর্গ ত্যাগ করে কী করবার আছে? প্রবীর একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে।

তবু নয়না বলে—ভাবতে পাচ্ছি না প্রবীর একটা নোংরা দোকানে বসে এনামেলের গ্লাশে চা খাচ্ছে। সত্যি ভাবাই যায় না। তোমার মনে আছে কিনা জানিনা, আমরা তো দেখেছি, কলেজে জল খেতে গেলে কখনো একবারে খেতো না জলটা, তিনবার করে গ্লাশ ধোয়াতো আর কেবলই বলতো কী যেন পড়েছে জলটায়—

নয়নার বিষণ্ণ মুখ দীপককে বিচলিত করে। বিস্মিতও করে, এতো দুঃখ পাচ্ছে নয়না? কেন? কেউ যদি নিজেকে 'নষ্ট করবো' বলে প্রতিজ্ঞা করে নষ্ট হতে থাকে কার কী করবার আছে? তাইতো করেছে প্রবীর শুনতে পাওয়া যায়।···কাকার বাড়ি থাকতো। সেখান থেকে চলে গেছে, কোথায় থাকে কে জানে। কীভাবে থাকে কে জানে।

বাস এসে যাচ্ছিলো, নয়না তাড়াতাড়ি বললো—আচ্ছা দীপক, এতো খারাপ হয়ে গেল কেন প্রবীর?

দীপক বলল—রাবিশ। সেই এক পাড়ার মেয়ের ব্যাপার—সে কেটে পড়েছে বলে জগতে আর মেয়ে নেই! তাই দেবদাস হয়েছেন

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলো, উঠে গেলো বাসে।

নয়না দাঁড়িয়ে থাকলো একটুক্ষণ।

এখন নয়নার মনে হলো, কী বোকার মতো করলাম আমি। দীপকের চলে যাবার সময় ওর দিকে তাকালাম না।

আশ্চর্য! কী হলো আমার! এতো অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম কেন? এই তাকানোটুকুই তো বিদায়বাণী!

ওই তাকোনোটির মধ্যেই তো স্পর্শের স্বাদ।

ঠিক চলে যাওয়ার মুহূর্তটি ভাবতে চেষ্টা করলো।

দীপক নিশ্চয় প্রত্যাশার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিলো, মুখে হাসি ফুটিয়ে। যে হাসির মধ্যে অনেকখানি কথা, হৃদয়ের অনেকখানি প্রকাশ।

আবার কতক্ষণে দেখা হবে, এই ভাবনাটা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরলো নয়না।

ওরা বেরিয়ে যাবার পর পত্রলেখাও অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। কাজকরা মেয়েটা জিজ্ঞেস করলো—উনি কে গো মাসিমা?

বিধুশেখরকে বলে দাদু, পত্রলেখাকে মাসিমা। এ সম্বোধন ওকে কেউ শেখায়নি। আপন বুদ্ধিতেই ঠিক করে নিয়েছে নয়নাকে দিদিমণি বলার সূত্রে।

পত্রলেখা অন্যমনাভাবে বললো—দিদিমণির বন্ধু

শুনে তরু অবিশ্বাসের হাসি হেসে উঠলো বললো—নাঃ বেটাছেলে আবার মেয়েছেলের বন্ধু হয় নাকি!

পত্রলেখা দৃঢ়স্বরে বলে—কেন হবে না? একসঙ্গে কলেজে পড়েছে—

তরু এই দৃঢ়স্বরের স্বরূপ জানে না। এর পর আরো কথা চালাতে গেলেই মাসিমা বলবেন—তোমার কোনো কাজ নেই তরু? যদি না থাকে, বিছানা পেতে শোওগে।

তরু আস্তে আস্তে পড়ে থাকা চায়ের কাপ-ডিশ খাবারের খালি প্লেট কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেলো।

পত্রলেখা ভাবলো—আরো অনেক আগেই আমার বাবাকে বলা উচিত ছিলো। আমি তো সেই প্রথম থেকেই আন্দাজ করছিলাম, একেবারে প্রথম থেকে।

প্রথম দিনকার কথা ভাবতে চেষ্টা করলো পত্রলেখা। চোখে ভেসে উঠল, সদ্যতরুণী নয়নার লাবণ্য ভরা মুখে-চোখে কেমন একটা আলো আলো হাসি। নয়না অতি উচ্ছ্বসিত হয়ে কথা তো কই সহজে বলতো না। একেবারে মাসির কোলের কাছে বসে পড়ে বলে উঠলো—জানো মাসিমণি, আজ না একটা ছেলে আমার নামটা শুনে একেবারে ফ্ল্যাট।

পত্রলেখা অবাক হয়ে গেলো—ফ্ল্যাট!

তাছাড়া আবার কী? বলে কিনা এই নামটি যিনি নির্বাচন করেছেন তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে আসতে ইচ্ছে করছে।

তোর কলেজের ছেলে?

নয়না রাগ দেখিয়ে বললো—তবে কি রাস্তার ছেলে?

তার নাম কী?

দীপক ঘোষাল।

ঘোষাল। ঘোষ নয়, ঘোষাল।

পত্রলেখার তারপর ভেবে হাসি পেয়েছিলো, ঘোষাল শুনে একটু স্বস্তির নিশ্বাস পড়েছিলো তার। মনে হয়েছিলো—যাক বাবা, তবু ভালো যে ব্রাহ্মণ।

ওই সামান্য সূত্রটুকু থেকেই পত্রলেখা সঙ্গে সঙ্গে মাকড়সার মতো জাল বুনে ফেলেছিলো। নইলে কী এমন কথা ওটা যে ঘোষ নয়, ঘোষাল ভেবে স্বস্তির নিশ্বাস পড়বে পত্রলেখার?

তারপর প্রায় প্রায়ই দীপকের গল্প করেছে নয়না।

বুঝলে মাসিমণি, সেই যে বলেছিলাম দীপক ঘোষাল? এতো পরিষ্কার মাথা ওর, বলা যায় না। ক্লাশে যা পড়ানো হয়, দীপক

ঘোষাল এমন জলের মতো বুঝে যায় যে, পরে অন্য ছেলেমেয়ে ওর কাছে গিয়ে বুঝতে বসে।···বলেও অনেকে। এখন অতো নিবিষ্ট চিত্তে বসে থাকার দরকার কী? দীপক ঘোষাল তো আছে।

পত্রলেখা হেসে বলে—তুইও তাই করিস?

নয়না হেসে বলে—আহা! তা বলে আমি মোটেই না। ওসব হচ্ছে—মানে ফাঁকিবাজ ছেলেমেয়েদের ব্যাপার।

পত্রলেখা তখনই ভেবেছে, ছেলেটি দেখতে কেমন কে জানে। কলেজে যদি কোনো ফাংশান-টাংশনে গ্রুপ ফটো তোলা হতো, বেশ হতো।

ছেলেটা দেখতে কেমন, সেটা জানবার দরকারটা কী পত্রলেখার?

আবার হয়তো কোনোদিন নয়না কলেজ থেকে ফিরে মুখে কোনো কথা বলছে না, অথচ তার মুখের ছবিটি যেন কতো কথা বলে বলে উঠছে।

পত্রলেখার ভয়-ভয় করেছে, পত্রলেখা তখন ওই মেয়েটাকে তার হঠাৎ পাওয়া স্বর্গভূমি থেকে নামিয়ে এনে মাটিতে দাঁড় করাবার চেষ্টায় একেবারে ধুলোমাটির জগতের কথা বলতে শুরু করেছে।

হয়তো বলেছে—জানিস নয়না, আজ তুইও বেরোলি আর জীবনলাল এসে হাজির। বলে কিনা, ফল বেচা ছেড়ে দেশে চলে গিয়েছিলো চাষবাস করতে। বছর তিন-চার থাকলো, চাষে গম-টমও ভালো উঠলো, কিন্তু মন বসলো না বাবুর।···কলকাতার জন্যে প্রাণ আকুল হয়ে উঠলো, তাই আবার চলে এসে 'আতা ফল চাই, আতা ফল চাই'—করে কলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হয়তো বলেছে—দিনকাল কী হয়ে যাচ্ছে রে দিন দিন? পাড়ার ভবতোষবাবুর ছেলেটাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। শুনলাম নাকি তুবড়ি তৈরী করেছিলো, পুলিশ ভেবে বসলেন, বোমার মশলা বানানো হচ্ছে—

আর নয়তো মানে কোনো কিছুই যখন চট করে মাথায় আসছে না, এমন সময় বলে উঠতো—বাবার কাণ্ডটা দেখছিস তো নয়না, এতো করে বলে মরছি, অন্য ফলটল খেতে দোষ কী? তা নয়, সেই শুধু একটি ডাব খেয়ে একাদশী করবেন।

পত্রলেখার সাধনা প্রায়শঃই সফল হতো।

অগত্যাই নয়নাকে তার স্বর্গভূমি থেকে নেমে আসতে হতো।

নয়না হয়তো বলতো—এ মা, জীবনলালের সঙ্গে দেখা হলো না আমার? ছেলেবেলায় আমায় অমনি অমনি কতো ফল দিতো মনে আছে মাসিমণি? আতা, পেয়ারা, কমলা!

হয়তো বলতো—কে বলতে পারে পুলিশের ধারণাই ভুল। আজকাল কতটুকু-টুকু ছেলেও যে কী করে বেড়াচ্ছে—

হয়তো বলতো—আর নিজে? তুমি যে স্রেফ নির্জলা একাদশী করো?

পত্রলেখা অলক্ষ্যে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতো, সেই আকাশে ভাসা মুখটা বদলে গিয়ে মাটিতে দাঁড়ানো ভাব এসে গেছে কিনা। এসে গেছে দেখে আপাত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচতো।

কিন্তু কিছুদিন পরে তো আর অবস্থা ঠিক ওরকম থাকলো না।

নয়না নিজেই একদিন বলে বসলো—দীপকের সঙ্গে ক্রমেই এতো ভাব হয়ে যাচ্ছে মাসিমণি, ভাবনা হচ্ছে।

পত্রলেখার বুক কেঁপে উঠলো, তবু পত্রলেখা সেই বুককে স্থির করে বললো—ভাবনা মানে? ভাবনা কেন?

কেন আর?

নয়না বসে পড়ে বললো—মনে হচ্ছে ওর খপ্পরেই পড়তে হবে। তোমার নয়নার আর উদ্ধার নেই।

পত্রলেখা তবু অবুঝের ভান করেছে, বলেছে—হ্যাঁ, তোমার মতো মেয়ে অমনি কার না কার খপ্পরে পড়ে যাবে!

কার না কার হলে কি আর বলতাম হে পত্রলেখা দেবী? একখানা ছেলের মতো ছেলে!

শুনে পত্রলেখার বুকটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লেগেছে, পত্রলেখা শুকনো মুখে বলেছে—তা হলে বাবাকে বলো ?

বাবাকে ? মানে দাদুকে ? কী যে বলো মাসিমণি ? আমি যাবো তোমার বাবাকে বলতে ? তাহলে আর এতো কাঠখড় পুড়িয়ে তোমায় বলে মরছি কেন এতাবৎকাল ? বলাবলির মধ্যে আমি নেই।

আবার হয়তো ফট করে বলে বসেছে—আচ্ছা থাক বাবা, এক্ষুনি আর বলে-টলে বোসো না। যাক আরো কিছুদিন।

অতএব বলে-টলে বসেনি পত্রলেখা।

কিন্তু অতএব কি ?

বলতে যে সাহসের দরকার, সেটা কি অর্জন করতে পারছিলো ?

বলেনি, এবং ওই বলাটা মুলতুবি রাখার জন্যে কতো দিকের কতো জলেই ছাতি ধরতে হয়েছে, হচ্ছে।

নয়নার গতিবিধি যে দিন দিন অনেকটা পাল্টে যাচ্ছে, দিনের রুটিন বদলে যাচ্ছে, প্রায়শঃই অনিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, এগুলো বাবার চোখ থেকে সামলে রাখতে কম মেহনত করতে হচ্ছে পত্রলেখাকে ?

অথচ বাবার সামনে স্পষ্ট মিছে কথা বলা সম্ভব নয়, আবোল-তাবোল গল্প বানানোও সম্ভব নয়। বিধুশেখর অবশ্য সর্বদা সবদিক তাকিয়ে বেড়ান না, নিজের রুটিনেই নিমগ্ন থাকেন, কিন্তু নয়নার যথাসময়ে ফেরা সম্পর্কে তিনি একটু সজাগ,···ভাবনা সেইখানে।

কোনো কোনো দিন হয়তো নয়না বাড়ি ফিরে বলে—আর খাওয়া যাবে না মাসিমণি, দেদার খাওয়া হয়ে গেছে—

পত্রলেখা বলে—যেখানে-সেখানে খাস কেন ?

নয়না কালো নয়ন তুলে বলেছে—যেখানে-সেখানে কী গো ? এমন অখাদ্য মেয়ে তোমার যে, যেখানে-সেখানে খেয়ে বেড়াবে ? তাছাড়া হয়তো হেসে হেসে বলেছে—পরের পয়সায় খেলে কখনো অসুখ করে ?

ক্রমশঃই তো টের পেয়েছে পত্রলেখা, এক অমোঘ অনিবার্যে হাতে আত্মসমর্পণ করতে হবে তাদের।

বিধুশেখর ভট্টাচার্যের ব্যক্তিত্ব কোনো কাজে লাগবে না।

দীপকদের বাড়িতে লোকসংখ্যা এ যুগের সংসারের মতো নয়। এ যুগে একই বাড়িতে কর্তারা চার-পাঁচ ভাই সপরিবারে বাস করছেন, এবং তৎসঙ্গে কর্তাদের ছেলেরা ঘর-সংসারী হয়ে উঠে সংখ্যা আরো বাড়িয়ে চলেছে এবং এক হাঁড়ির মধ্যেই আশ্রয় নিচ্ছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

দীপকদের বাড়িটা এমনি এক বিরল ব্যতিক্রম।

মেয়েদের কথা বলা শক্ত, তবে এবাড়ির পুরুষরা এতে গর্বিত। দীপক ব্যতীত বাড়ির অন্য সব পুরুষেরাই নিজেদের এই একান্নবর্তিতার মহিমা নিয়ে গরিমা করেন, এবং সুবিধে পেলেই লোকের কাছে গর্ব করে বলেন, এই ঘোষালবাড়ির গিন্নীরা এখনো কর্তাদের অধীন, আর ছেলেরা বৌয়ের বশ নয়।

তার প্রমাণস্বরূপ এঁরা ছুটির দিনে স্ত্রীকে নিয়ে স্ত্রীর বাপের বাড়ি অথবা সিনেমা-থিয়েটারে ছোটেন না, পারিবারিক মিলনসুখ উপভোগ করেন।

যথাক্রমে তাসের ও দাবার আড্ডা বসে অথবা ভাইয়ে ভাইয়ে ছিপ ঘাড়ে নিয়ে মাছ ধরতে ছোটেন। এক কথায় এঁরা যেন বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই রয়ে গেছেন।

শুধু দীপকই এদের মধ্যে এক সৃষ্টিছাড়া ব্যতিক্রম। দীপক যেন এদের কেউ নয়, দীপক এদের বাড়ির একটি নিরুপায় বিরক্ত অতিথি।

দীপক বাড়ির প্রত্যেকটি ছোট ছেলেমেয়ের নামটুকুও জানে কিনা সন্দেহ, বাড়ির বড়দের সকলের সঙ্গে সপ্তাহে একটা কথা বলে কিনা সন্দেহ।

এ পরিবারের চিন্তা-ভাবনা-সমস্যার সঙ্গে দীপকের যেন কোনো যোগ নেই। দীপক যেন নিতান্ত নিরুপায়তার শিকার।

এই বৃহৎ গোষ্ঠীর কোনো একটু খাঁজে নিজেকে কোনোমতে গুঁজে রেখে দীপক আকাশে ডানা মেলার দিন গুনছে।

লেখাপড়ায় খুব বেশী ভালো বলে দীপকের এই উন্নাসিকতা কোনোমতে বরদাস্ত করে চলেন এঁরা, তবে আড়ালে সমালোচনার ঝড় বয় বৈকি। যে ছেলে এতো বড়ো পরিবারে নিজের একার জন্যে একখানা ঘর দাবি করে বাগিয়ে নিয়ে ফেলতে পারে (হলেও সেটা চিলেকোঠার ঘর), সে ছেলে যে বিয়ে করেই বৌ নিয়ে আলাদা হবে, এ সবাই দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছে।

সংসারের ঝুনো ব্যক্তিদের দিব্যদৃষ্টিটা যে নির্ভুল, তাতে আর সন্দেহ কী? নইলে···

ওরা তো আর জানতেন না এ বাড়ির মেজকর্তার দীনেশ দিলীপ আর দীপক নামের ছেলে তিনটের মধ্যে দীপক নামের উন্নাসিক আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর ছেলেটা মনে মনে মতলব ভেজে বসে আছে আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করতে না পারা পর্যন্ত বৌ আনবে না। পায়ের তলায় একটু মাটি পাবার অবস্থা হলেই এই ঘোষালবাড়ির ভিটের মাটিকে ধুলোমাটির মতো ত্যাগ করে এখান থেকে কেটে পড়বে।

জানতেন না তবু ওঁরা জেনে বুঝে বসে আছেন—এর দ্বারা এই হবে।

সমাজবদ্ধ মানুষের অবস্থা যে কী শোচনীয়, তার জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রেম-ভালোবাসা ইচ্ছে-বাসনাগুলি বহুজনের বহুবিচিত্র দৃষ্টির স্নায়নায় কী বিকৃতই না দেখায়!

একটা মানুষ যদি জটিল সংসারচক্রের পাঁক থেকে মুক্ত হয়ে একটু খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে চায়, যদি নিজেকে নিয়ে নিজের মতো করে বাঁচতে চায়, যদি মাটির ঘরের চৌকাঠ পার হয়ে বেরিয়ে এসে আলোর আকাশে চোখ ফেলতে চায়, অমনি শত শত চোখ কুঁচকে উঠবে, শত শত ভুরু আকাশে উঠবে আর শত শত কণ্ঠ ধিক্কার দিয়ে বলে উঠবে—তুমি স্বার্থপর, তুমি উন্নাসিক, তুমি আত্ম-কেন্দ্রিক। বলবে—তোমার স্বভাব ভালো নয়, তোমার চরিত্র খারাপ।

অতএব, দীপককে সমালোচনার পাত্র হতেই হবে। কারণ দীপক তার ভালোবাসার নিধিটিকে একটি শান্ত সুন্দর সুরুচি সৌন্দর্যময় ঘর দিতে চায়, দীপক তার সেই বহুদিন আগে চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাওয়া ঠাকুর্দার গড়া অনেক খোপওয়ালা জীর্ণ বিবর্ণ বাসাখানার কোনো একটা খোপের মধ্যে মাথা গুঁজে বসে নবীনা প্রিয়ার সঙ্গে বক্‌বকম্ করতে পেয়েই চরিতার্থ হতে চায় না, দীপক তার নিজের ক্ষমতায় একখানি নীড় গড়তে চায়।

নয়না যদিও বলে—তোমাদের বাড়ির এতো বৌ ওই খোপের মধ্যে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিয়ে কাটাতে পারছে, আর তোমার বৌ পারবে না?

কিন্তু দীপক তো নিজে জানে, ওই পারাটা নয়নার পক্ষে কী অসম্ভব। প্রতি পদে দোষ বেরোবে নয়নার।

নয়নার এক বিরাট দোষ নয়না লেখাপড়া করে, লেখাপড়া করবে হয়তো বরাবরই। কারণ নয়না ওই জিনিসটাকে ভালোবাসে। বলতে কি প্রাণতুল্য জ্ঞান করে।

নয়নার আরো দোষ বেরোবে, ও শুধু স্বামীর সংসারটুকু পেয়েই সন্তুষ্ট থাকবে না, ও স্বামীকেও চাইবে। নয়নার হয়তো আরো দোষ বেরোবে, নয়না গান গাইবে, নয়না ছবি আঁকবে, নয়না বহিঃপৃথিবীর সঙ্গে যোগ রাখতে চাইবে।

দীপকের বৌ যদি এতো দোষের আকর হয় তাহলে দীপকের সংসার তাকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করবে কী করে? হলেই-বা দীপক মেজগিন্নীর কোলের ছেলে।

নয়নার মধ্যে এ সন্দেহের বাষ্পও নেই। কিন্তু দীপকের মধ্যে তো আছে।

দীপক তাই নিজস্ব একখানি নীড়ের স্বপ্ন দেখতে চাইছে।

অথচ ওই চাওয়ার মধ্যে এবং আপন ক্ষমতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে উঠতে পারছে না দীপক। তাই দীপক অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছে।

কাটোয়ার পণ্ডিত সম্মেলন থেকে ফিরে পর্যন্ত বিধুশেখর একটু অস্থিরতা অনুভব করছেন।

সভার সভাপতি হিসেবে বেনারস থেকে অতিবৃদ্ধ মহামহোপাধ্যায় শ্রীধর পণ্ডিতের সঙ্গে দেহরক্ষী হিসেবে তাঁর যে তরুণ পৌত্রটি এসেছিল, তাকে দেখে বিধুশেখর এক মোহময় স্বপ্নের জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন।

পুরুষোচিত দীর্ঘোন্নত গঠন অথচ দেবোপম সুকুমার কান্তি ওই ছেলেটির মধ্যে বিধুশেখর যেন অনেক সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছেন। দেখতে পেয়েছেন এক আশ্চর্য দীপ্তি।

পণ্ডিতের নাতি বলে যে কেবলমাত্র সংস্কৃতের চর্চাই করেছে তা নয়, ছেলেটি বেনারস ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে ইঞ্জিনীয়ার হয়ে বেরিয়ে, উচ্চতর বিদ্যালাভের আশায় বিদেশে যাত্রার তোড়জোড়ের মধ্যবর্তী সময়টুকু নষ্ট না করে, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে সংস্কৃতের চর্চা করছে।

ছেলেটি যেন সভ্যতা শালীনতা ভদ্রতা এবং বিনয়ের প্রতীক।

আর এক অদ্ভুত যোগাযোগ যে ছেলেটি নয়নাদের পাশের ঘর।

বিধুশেখরের মনে হয়েছে, এ হচ্ছে ঈশ্বরের যোগাযোগ। সেই যোগাযোগের আয়োজনের জন্যেই এই পণ্ডিত সমাবেশ। সেই সমাবেশে পৌরোহিত্য করার জন্যে শ্রীধর পণ্ডিতের আগমন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীধর পণ্ডিত নাকি বিগত দশ-বারো বছরের মধ্যে বেনারসের বাইরে পা দেননি।

হঠাৎ কী ইচ্ছেয় কে জানে ওখানে এসেছিলেন। কিন্তু বাড়ির লোক তো একা ছাড়তে পারে না? তাই ওই নাতি।

বিধুশেখর বিশ্বাস করছেন, এটা ভগবানেরই কোনো নিগূঢ় ইচ্ছার পরিচয়লিপি।

কিন্তু বিধাতা তো আর ছাঁদনাতলা, বাসরঘর, সম্প্রদানকক্ষ সাজিয়ে বসে বর-কন্যার চারহাত এক করে দেবেন না? তার জন্যে মানুষের হাত লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে মানুষ মানেই তো বিধুশেখর।

অথচ বিধুশেখর সেই কর্মকাণ্ডের বহুবিধ কাণ্ড স্মরণ করে করে যেন বিশেষ অসহায়তা অনুভব করছেন, ক্ষমতা খুঁজে পাচ্ছেন না। একদা যে গৃহিণীহীন গৃহেও একা তিনিই একে একে তিনটি মেয়েকে পাত্রস্থ করেছেন একথা যেন এখন আর বিশ্বাসে আনতে পারছেন না।

তাই চির শান্ত বিধুশেখরের মধ্যে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে। যদিও এও ভাবছেন, পত্রলেখার কাছে একবার ইচ্ছে এবং ঘটনাটি পেশ করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, তবু কেমন করে ঠিকমতোভাবে উপস্থাপিত করবেন সেটাই হয়েছে চিন্তার বিষয়।

বিদ্যার পরিমাপ ডিগ্রীর মধ্যে অবস্থিত, সেটা বোঝানো শক্ত নয়। কিন্তু রূপ গুণ আচার আচরণ নম্রতা ভদ্রতা—এগুলি কি চট করে বোঝানো সম্ভব? ঠিকটি বোঝাতে না পারলে ওদের মনকে আগ্রহে অধীর করে তুলবেন কী করে? যেমন অধীর তিনি হয়েছেন?

মন তো মাত্র একটাই নয়, একাধিক যে।

পত্রলেখার সমর্থন চাই, চাই মহাশ্বেতার সমর্থন. তাছাড়া আছে নয়না। বিধুশেখরের প্রাণের প্রতিমা কুরঙ্গী নয়না।

অবশ্য বিধুশেখর এ বিশ্বাস রাখেন, তিনি যদি একেবারে নিষ্পত্তির গলায় ঘোষণা করেন, কাটোয়ায় গিয়ে একটি ছেলে দেখলাম, সর্বাংশে নয়নার উপযুক্ত, ওখানেই কুরঙ্গী নয়নার বিবাহ স্থির করছি—।

তা হলে প্রতিবাদ করবার সাহস কারো হবে না। কিন্তু বিধুশেখর সেটা চান না।

নিজের ইচ্ছার ভার অপরের উপর চাপিয়ে, তাকে ভারাক্রান্ত করে তোলবার পক্ষপাতী নন বিধুশেখর। অতএব, উনি সমর্থকদের কাছে পাত্রের রূপগুণের বিশদ পরিচয় দিয়ে তাদের আপন ইচ্ছায় উদ্বেল করতে চান। ওই বিশদটা কীভাবে সম্ভব সেটাই চিন্তা।

বিধুশেখরের হাতে অবশ্য একটি উপকরণ আছে, পণ্ডিত সম্মেলনের যে একটি গ্রুপ ফটো উঠেছিল তার এক কপি হস্তগত হয়েছে।

ভাগ্যক্রমে হঠাৎই হয়েছে। গতকাল সভার উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে কে যেন বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেছে।

ছবির মধ্যে পিছনের সারিতে ওই ছেলেটি রয়েছে। মাথাটা অনেকের মাথা ছাড়ানো বলে মুখটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দেখুক সবাই সেটা। প্রথম ছাপ পড়ুক!

বিধুশেখর যখন নিজের খাতাপত্রের সঙ্গে সেই ফটোর কপিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে পত্রলেখাকে ডাকবেন ভাবছেন তখন পত্রলেখা ঘরে এলো।

বিধুশেখর খাতাপত্রের মধ্যেই চোখ রেখে বললেন—আজ আর এখন ডাবটা খাব না পত্রলেখা। ইষৎ শ্লেষ্মা অনুভব করছি।

পত্রলেখা লজ্জিত হলো।

পত্রলেখা ডাব আনেনি, এমনিই এসেছে। অথচ এই সময়ই ডাবটি খান বিধুশেখর।

পত্রলেখা কুণ্ঠিতভাবে বলে—না ঠিক, ইয়ে, ডাব নিয়ে আসিনি। একটা কথা বলতে এসেছিলাম—।

বিধুশেখর মৃদু হেসে বলেন—আশ্চর্য যোগাযোগ তো! আমিও ঠিক এই মুহূর্তে তোমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে ডাকবো ভাবছিলাম।

পত্রলেখার বুকটা কেঁপে ওঠে।

তবে কি নয়নার ব্যাপারটা হঠাৎ কোনোভাবে বাবার গোচরীভূত হয়ে গেছে?

হতেই পারে!

মাঝে মাঝেই বাবাকে যেন অন্তর্যামী মনে হয় পত্রলেখার, মনে হয় বুঝি গণৎকার। না হলে যে কথা মনের সঙ্গোপনে আছে, বাবা সে কথা টের পান কী করে? যে ঘটনা একেবারে বাবার অসাক্ষাতে ঘটেছে, বাবা ঠিক জানার মতো বলেন কী করে?

পত্রলেখার এক পিসতুতো ভাই আছে, দূর সম্পর্কের পিসির ছেলে, ছেলেটা যেমনি বখাটে তেমনি বক্তার। বিধুশেখর তাঁর এই

ভাগ্নেটিকে আদৌ পছন্দ করেন না, বাড়িতে আসা-যাওয়ায় খুশী হন না, অথচ সে আসবেই কারণ আসাটা তার রীতিমতো দরকার।

যখনি তার নেশার পয়সায় ঘাটতি পড়ে, মামার বাড়ি এসে উদয় হয়। অবশ্য পারতপক্ষে বিধুশেখরের উপস্থিতিতে আসে না, বিধুশেখর যখন কলেজে যান তখন এসে হাজির হয়। এসে চান করে, খায়, বিশ্রাম করে, পত্রলেখার কাছে 'লেখাদি, লেখাদি' করে নানান দুঃখের কাঁদুনী গেয়ে যে কটা পারে টাকা বাগিয়ে বিধুশেখর ফেরার আগে কেটে পড়ে।

পত্রলেখা সাহস করে বাবাকে বলে না, মানে নিজে থেকে বলতে যায় না। কিন্তু আশ্চর্য, বাবা ঠিকই বাড়ি ঢুকে একটু পরেই বলে ওঠেন—আবার আজ গোবিন্দটা এসেছিল বুঝি?

পত্রলেখা বাবার অপ্রিয় বিষয়টা নিজে থেকে বাবাকে বলতে যায় না বটে কিন্তু বাবা জিগ্যেস করলে তো আর অস্বীকার করতে পারে না? তাই পত্রলেখাকে বলতেই হয়—'এসেছিল।

বিধুশেখর বিরক্ত গলায় বলেন—আঃ, এই এক উৎপাত হয়েছে। ওকে ওই টাকাপত্র দেওয়াটা তুমি বন্ধ করো পত্রলেখা। এতে করে ওর অনিষ্টই করা হচ্ছে। ও তো আর তোমার দেওয়া টাকাগুলো নিয়ে চাল-ডাল কেনে না? কেনে নেশার জিনিস।

পত্রলেখা বিশ্বস্ত গলায় বোঝাতে চেষ্টা করে—না না, সত্যই বেচারার অভাব হয়েছে, খুব অভাব। তখন বিধুশেখর বলেছেন—হলেই ভালো।

কিন্তু ওই হওয়াটা যে গোবিন্দর পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, সেটাও তাঁর মুখের রেখায় ফুটে ওঠে।

নেহাৎ নাকি পত্রলেখার মানসম্মানের প্রশ্ন। তাই আর কিছু বলেন না। বিধুশেখর নয়তো বলেন—টাকাকড়ি তো তোমার কাছে বেশী থাকে না, আর কিছু রাখো তোমার কাছে।

পত্রলেখা ভেবে পায় না, যে লোকটা বাবার অনুপস্থিতিতেই আসে বেছে বেছে, বাবা কী করে তার আসাটা জানতে পারেন?

ওরুকেও তো বারণ করা আছে, বিধুশেখরের কানে গিয়ে না বলতে, কিন্তু পত্রলেখা ভেবে পায় না, ভাবে বাবা কি হাত গুনতে জানেন ?

নয়না অবশ্য বলে—টের পান গাঁজার গন্ধে। তোমার গুণধর ছোট ভাইটি যা খান।

কিন্তু পত্রলেখা একথা বিশ্বাস করে না।

গাঁজা তো গোবিন্দ এ-বাড়িতে বসে খায় না, অন্য কোথায় কখন খায় কি খেয়েছে। বলে—ও চলে যাবার পরও সারা বাড়িতে গন্ধ থাকতে পারে ?

আর 'অন্তরযামী' বলাটাও বোধহয় আতিশয্য নয়। পত্রলেখা যখন যে সমস্যাটা আসে এই সংসার জীবনে, না বলতেই অনুভবে টের পেয়ে যান বিধুশেখর। প্রশ্ন করে জেনে নিয়ে তার প্রতিকারের চেষ্টা করেন।

পত্রলেখার জীবনে সাধ-আহ্লাদ বলে কিই-বা আছে, তবু যা আছে বিধুশেখরকে না বলতেই বুঝতে পারেন।

সব থেকে অবাক হয়েছিল সেবার পত্রলেখা তার ভাসুরপোর বিয়ের সময়।

পত্রলেখা যে কটা দিন শ্বশুর বাড়ি ঘর করেছে, ওই ছেলেটাই ছিল তখন তার আনন্দের উপকরণ, ওই শিশুটিই ছিল তার সঙ্গী। ছেলেটা অকৃতজ্ঞ নয়, বড় হয়ে সেই ছেলেটাই এযাবৎকাল পত্রলেখার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে এসেছে। একটু বড় হয়ে অবধি নিজে নিজে চলে আসতো।

পত্রলেখার একান্ত ইচ্ছে হয়েছিল শঙ্কুর বৌকে একটা সোনার জিনিস দিয়ে মুখ দেখে। কিন্তু বাবার সামনে সে কথা তুলতে লজ্জা করেছে পত্রলেখার।

দেবে অবশ্য নিজের গহনা থেকেই, কিন্তু সে তো তোলা আছে বাবার পুরনো সিন্ধুকে। চাবিটা চেয়ে নিলেই মিটে যায় কিন্তু পত্রলেখা দ্বিধায় লজ্জায় বারবার বলতে গিয়ে থেমে গেছে।

কিন্তু এমন আশ্চর্য, যেদিন পত্রলেখা বৌর মুখ দেখতে যাবে এবং মরিয়া হয়ে ভাবছে, 'বলেই ফেলি বাবাকে', বিধুশেখর কিনা নিজেই পত্রলেখাকে ডেকে বললেন—শঙ্কু তোমায় এতো ভালোবাসে, ওর বৌকে তোমার তো ভালো কিছু দেওয়া উচিত। দেখো যদি তোমার নিজের থেকে কিছু—পড়েই তো আছে—

পৈঁতে থেকে চাবিটা খুলে পত্রলেখার হাতে দিয়ে দিয়েছিলেন। অবাক হয়ে গিয়েছিল পত্রলেখা।—ভগবান মনে হয়েছিল বাবাকে।

আর একবার পাড়ার ক'জন মহিলার গঙ্গাসাগর যাত্রার খবরে পত্রলেখার হঠাৎ ভারী শখ হয়েছিল যাবার।

কিন্তু বাবাকে বলতে পারছে না সাহসে ভর করে।

বিধুশেখর ভীতিকর বলে নয়, পত্রলেখাই ভীতু বলে।

অথচ নিজের মনে ভাঙ্গাগড়া চলছে,—কখনো তো কোথাও যাই না, জীবনে আর হলো কী, না করতে পেলাম আর পাঁচটা সধবা মেয়ে মানুষের মতো স্বামীপুত্র নিয়ে সংসার, না করলাম আর পাঁচটা বিধবার মতো তীর্থধর্ম। বলেই দেখি না, বারণ করলে, বলেই ফেলবো, এমন সুযোগ আর কবে হবে বাবা?

কিন্তু বলতে হলো না কিছুই।

বিধুশেখর নিজে থেকেই বললেন—দু-চারটে দিন আমি ঠিক চালিয়ে নিতে পারবো পত্রলেখা, তুই বরং মাধববাবুর দিদিদের সঙ্গে গঙ্গাসাগরটা করে আয়। সব সময় তো এমন সুবিধে আসে না। টাকাকড়ি যা লাগে, আমি ঠিক করে রাখছি।

কী করে সম্ভব হয়েছিল এটা?

পত্রলেখা জানে না।

পত্রলেখার এখন মনে হলো, কোনোভাবে গোচরীভূত নয়, বাবা তাঁর নিজস্ব আধ্যাত্মিক ক্ষমতার বলে নয়নার ব্যাপারটা জেনে ফেলেছেন। এখন বাবা পত্রলেখাকে শুধোবেন—কী পত্রলেখা, তুমি না ওর মায়ের অধিক? এই তোমার দায়িত্ববোধ?

হায় ভগবান! কী জবাব দেবে পত্রলেখা?

তবু সাহসে বুক বেঁধে বলে—বলুন ?

বিধুশেখর বলেন—আচ্ছা আমার কথাটা না হয় একটু পরেই হবে, তোমার বক্তব্যটা শুনি।

পত্রলেখা জানে, 'সমীহ' শব্দটার অর্থ কী, জানে 'শ্রদ্ধা-সম্মান' কাকে বলে। তাই পত্রলেখা নরম গলায় বলে—আপনিই আগে বলুন না বাবা।

বিধুশেখর আশঙ্কা করছিলেন, পত্রলেখা বোধহয় বাড়িতে মিস্ত্রী লাগানোর কথা তুলবে, কিছুদিন আগে একবার এ বিষয়ে ওয়ার্নিং বেল দিয়ে রেখেছিল। বাড়িটা যে জীর্ণ হয়ে গেছে, মেরামত করা বিশেষ দরকার। সেই আভাসটি ছিল তার কথায়। আজ নিশ্চয় সেটাই পাকাপাকি করতে চাইছে।

ঠিক আছে, বিধুশেখরও আর ওতে বিলম্ব করবেন না, বাড়িতে শুভ কাজ লাগার আগে গৃহ সংস্কারের একটা রীতিও আছে। তাই বিধুশেখর বললেন—না না, তুমিই বলো কী বলছিলে ? তোমার কথাটা বোধহয়, খুব বেশী নয় ?

কিন্তু পত্রলেখা তার বাবার এই নিরুদ্বেগ শান্তির উপর একখানি হাতুড়ির ঘা বসালো। বললো—আমিও তো একটু সময় নিতাম। নয়নার বিষয়ে কিছু বলার ছিল—

কথাটা নির্দোষ, এর মধ্যে হাতুড়ির ঘা দৃশ্যমান নয়, তবু যেন বিধুশেখর চমকে উঠলেন। যেন বুঝতে পারলেন, অমোঘ নিয়তি এমন কিছু একটা নিয়ে আসছে, যার সঙ্গে বিধুশেখরের আশা-আকাঙ্ক্ষার মিল নেই।

তবে চমকে ওঠার অভ্যাস নেই বলেই আস্তে বললেন—কোন্ বিষয়ে বলো।

পত্রলেখার নিজেরও তো বুকের মধ্যে হাতুড়ি পড়ছে 'দমাস দমাস' করে। পত্রলেখার শাশুড়ী কোনো একটা ভীতিকর ঘটনার বর্ণনায় বলতেন, 'বুকের মধ্যে যেন ধোপায় কাপড় আছড়াচ্ছে', কথাটা শুনে বালিকা পত্রলেখা হাসতো, ঠিক এই মুহূর্তে পত্রলেখার

সেই কথাটা মনে পড়লো। হাসির সঙ্গে নয়, মনে হলো সেকালে, ছোটখাটো কথার মাধ্যমে প্রকাশভঙ্গী কী প্রাঞ্জল ছিল!

পত্রলেখা তার 'খোপার পাট' বুকটাকে স্থির করে আস্তে বললো —নয়নার বিয়ের বিষয় বলছি বাবা! বিয়ের বয়েস তো হলো—

বিধুশেখর বললেন—একেবারে ভাবছি না তা ভেবো না, তবে লেখাপড়া করছিল এতোদিন। কিন্তু তুমিও কিছু বলোনি এযাবৎ—

পত্রলেখা বাঁচলো।

পত্রলেখার বক্তব্যের অনুকূলে এসে যাচ্ছে কথার মোড়। পত্রলেখা এ সুযোগ ফসকাতে দেবে না। তাড়াতাড়ি বলে—বলিনি তা সত্যি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বলবার দরকার হয়েছে। নয়না একটি ছেলেকে—

বিধুশেখরের বুক থেকে বড় গভীর একটি নিশ্বাস পড়লো।

বিধুশেখর বুঝলেন, তাঁর আবেদনপত্র পেশ করবার আগেই তুলে নিতে হবে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় কী অদ্ভুত!

বিধুশেখর সন্তর্পণে নিশ্বাসটি ফেলে বললেন—ছেলেটি সম্পর্কে তুমি জানো?

পত্রলেখা ভাবলো, ভগবান কী করুণাময়, কতো ভাবনা করছিলাম আমি, অথচ কতো সহজেই বলা হয়ে গেলো। পত্রলেখা বললো—আপনি যখন কাটোয়ায় গিয়েছিলেন, বাড়িতে ডেকে এনেছিল ছেলেটিকে। সহপাঠী, ইউনিভার্সিটিতে দুজনের পড়ার বিষয় একই ছিল। পড়াশোনায় নাকি খুবই ভালো, দেখতে চমৎকার, নাম দীপক ঘোষাল।

ঘোষাল!

বিধুশেখর একটা বক্তব্য পেলেন, বললেন—ঘোষালদের সঙ্গে গোস্বামীদের বিবাহাদি হয় বলে মনে হয় তোমার?

পত্রলেখা একটু হেসে ফেলে বলে—আপনার থেকে আমার বেশী জানার কথা নয় বাবা! তবে ভাগ্য ভালো যে ব্রাহ্মণই। ব্রাহ্মণ না হলেও তো—

দিতেই হতো। কী বলো?

বিধুশেখরও হাসলেন, ক্ষোভের দুঃখের আশাভঙ্গের।

বললেন—আমার মনে হচ্ছে পত্রলেখা, আরো আগে বোঝা উচিত ছিলো তোমার। তুমি সর্বদা কাছে কাছে থাকো—

পত্রলেখা মাথা নীচু করে বসে থাকে।

বিধুশেখর বলেন—ওকে একবার আমার কাছে আসতে বোলো। আর বোলো, অবস্থাটা ওর কতদূর, আমায় যেন স্পষ্ট করে জানায়।

পত্রলেখা চমকে বলে—অবস্থা মানে?

আমি কোনো মানে ভেবে বলছি না পত্রলেখা, শুধু বলছি, বিবাহ জিনিসটা ক্ষণিকের নয়, এর জন্যে নির্ভুল বিবেচনার প্রয়োজন আছে। সেই বিবেচনার অবস্থা ওর আছে কিনা, সাময়িক মোহে বিচারে না ভুল ঘটে, সেটাই কথা।

বাবা, আপনি ওর কথায় রাগ করবেন না—পত্রলেখা ব্যাকুল হয়।

বিধুশেখর গভীর গম্ভীর গলায় বলেন—ছেলেমানুষের মতো কথা বলছিস কেন পত্রলেখা? রাগের কথা উঠছে কোথা থেকে? তবে একথা ঠিক এ আমি কোনোদিন ভাবিনি। কেন ভাবিনি তা জানি না। হয়তো সবাই আমরা একচক্ষু হরিণ তাই।

একটু থামলেন।

আস্তে আরো গভীর গলায় বললেন—যুগের কাছে সবাইকেই পরাজয় স্বীকার করতে হবে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পালা।

বিধুশেখর সেই গ্রুপ ফটোটি সাবধানে টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে পুরে ফেলে নিজের খাতাপত্র নিয়ে ওল্টাচ্ছেন। পত্রলেখা বসে আছে চুপ করে।

একটুক্ষণ পরে পত্রলেখা বলে ওঠে—আপনি যে কী বলবেন বলছিলেন বাবা?

বিধুশেখর মুখ তোলেন, একটু হাসেন, বলেন—সে আর বলার দরকার হবে না।

পত্রলেখার বুকটা আর একবার কেঁপে ওঠে। কী বলার ছিলো বাবার। তবে কি উনিও নয়নার বিষয়েই—

পত্রলেখার অপরাধিনী অপরাধিনী মুখটা দেখে বোধহয় বিধুশেখরের মমতা আসে, তাই নিজে থেকেই বলেন—আমি তোমার সঙ্গে একটি পাত্রের সম্পর্কেই আলোচনা করবো ভাবছিলাম, তা সে তো এখন বৃথা কথা হবে।

পত্রলেখার প্রাণটা হাহাকার করে ওঠে, বাবা নিজে পাত্র মনোনয়ন করেছিলেন। নয়নার নির্বাচিত বর কি সে পাত্রের তুল্য হবে?

—তাছাড়া—

নয়না নিজের বর নিজে ঠিক করে বসলো, এটা যেন বিধুশেখরকে অপমান করা। ভগবান, এটা তো তুমি না করলেই পারতে! কতো সুখের ঘটনা হতো সেই বিয়েটা, যদি বাবা যাকে যোগ্য বলে ভেবেছেন, তার সঙ্গেই হতো। তা নয়। বিধুশেখরকে মাথা হেঁট করতে হচ্ছে।

বিধুশেখরের এই অপমানে যেন পত্রলেখারও অপরাধের অংশ আছে। পত্রলেখার উচিত ছিলো অবস্থা আয়ত্তে থাকতে বাবাকে জানানো।

দীপক ধারণা করতে পারেনি, দীপকের অজানিতে একা একা দীপকদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হবে নয়না।

শুনে মাথায় হাত দেয় দীপক। বলে—সর্বনাশ! এই সাংঘাতিক মহিলাকে আমি গলায় ঝোলাতে যাচ্ছি!···ভবিষ্যতে কপালে কী আছে আমার নিজেই ভেবে পাচ্ছি না!

নয়না হেসে বলে—কেন, হলোটা কী?

ওরা একটা পুরনো জায়গা বেছে নিয়ে বেড়াতে এসেছিলো আজ।

এ যুগে আর কে কবে পরেশনাথ মন্দিরের প্রাঙ্গণে এসে হাওয়া

খেতে বসে? আসে ছোট ছোট বাচ্চারা, লাল মাছকে ময়দার গুলি খাওয়ায়, গরুর মুখ থেকে জল পড়াবার জন্যে জলের ট্যাপ খুঁজে বেড়ায়, বৃহৎ শ্বেতহস্তীর পায়ের আড়াল থেকে লুকোচুরি খেলে।

বড়রা যদি আসেও, নয়নার মতো বা দীপকের মতো নয় তারা।

জায়গাটা হঠাৎই নির্বাচন করেছিলো দীপক।

সাহিত্য পরিষদে প্রায়ই আসে ওরা, কোনোদিনই মনে পড়ে না এই একটা জায়গা কাছাকাছির মধ্যে আছে; যেখানে দুজনে মুখোমুখি বসবার সুবিধে আছে। এ পৃথিবীতে যেটা নিতান্তই দুর্লভ।

না, জায়গাটাকে নির্জন বলা হচ্ছে না, লোকে লোকারণ্যই বলা যায়। শুধু সুবিধে এই—তারা চেনা লোক নয়। চেনা লোকের থাকার এবং আসার সম্ভাবনা নেই মনে হয়।

দীপকের এ পাড়ায় মামার বাড়ি, ছেলেবেলায় যখন মামার বাড়ি আসতো, প্রায়ই তিন পিঠোপিঠি ভাই এখানে বেড়াতে আসতো। আর বড়ো মামা বলতো—এখন আর ওর কী শোভা-সৌন্দর্য দেখছিস তোরা, সবই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখন ফোয়ারায় ভালো করে জল ওঠে না, একটা জীবজন্তুরও মূর্তির মুখ দিয়ে জল বেরোতে চায় না, শ্বেত-পাথরের হাতীদের রং হলদেটে হয়ে গেছে—

বড়োরা চিরদিনই ছোটোদের এই কথাই বলে আসছে—আগে যেমনটি ছিলো এখন আর তেমনটি নেই। আমরা যে শোভা-সৌন্দর্য দেখেছি তোরা তা দেখতে পেলি না।

যদি নতুন সংস্কারে সেসব অধিক শোভা সৌন্দর্যময় হয়, তবুও বলে।

বলে—আহা সাবেকী যা ছিলো সে মর্যাদা আর এতে বজায় আছে? পুরনো মর্যাদাই আলাদা।

মোটকথা, লোকে নিজের সেই উজ্জ্বল চোখ হারিয়ে ফেলে বলেই সব নিষ্প্রভ লাগে, সব কিছুই সৌন্দর্যহীন লাগে।

দীপকের ছেলেবেলায় দীপকের বড়ো মামা বলতো—এখন আর সে শোভা নেই—

দীপকও বললো সে কথা।

বললো—এখন আর তেমন নেই।

তবু যা আছে তাই অনেক।

তুজনে পাশাপাশি তু দণ্ড বসবার ঠাঁই আছে।

দীপক যখন বলেছিল—নাই-বা গেলে সাহিত্য পরিষদে, চলো একটা নতুন জায়গায় গিয়ে বসিগে—

তখন নয়না আপত্তি তুলেছিলো, বলেছিলো—দেরী হয়ে যাবে। কিন্তু এসে বসে এতো ভালো লেগে গেল যে দীপককে তিনদফা ধন্যবাদ দিয়ে বসলো।

দীপক বললো—দেখলে তো, আসতে চাইছিলে না!

তারপরই বলে উঠলো—এই নয়না, কী কাণ্ড করা হয়েছিলো কাল? এই সাংঘাতিক মহিলাকে আমি গলায় ঝোলাতে যাচ্ছি। ভবিষ্যতে আমার কী হবে নিজেই ভেবে পাচ্ছি না।

নয়না হেসে বললো—কেন, কী হলো?

তুমি একা আমাদের বাড়ি গিয়েছিলে?

নয়না হেসে ফেলে।

নয়না বলে—কেন, গেলে কী হয়?

কী হয় তা জানি না। তবে যে কোনো সময় সাপের গর্তে বা বাঘের গুহায় ঢুকে পড়া যে তোমার পক্ষে অসম্ভব নয় তার প্রমাণ পেলাম।

নয়না গম্ভীর হয়ে বলে—তুমি যতো সব বলছো মোটেই তা নয়। আমায় কতো যত্ন করে বসালেন তোমার বৌদি, চা খাওয়ালেন, সিঙ্গাড়া আর সন্দেশ খাওয়ালেন—আরে ভুলে যাচ্ছি, তার সঙ্গে ডালমুটও ছিলো, তাছাড়া—

দীপক রেগে বলে, আর ফিরিস্তি বাড়াতে বসলে চাটি খাবে। প্রথম থেকে কী ঘটলো মানে কী ঘটনা ঘটালে তুমি সেইটা পরিষ্কার বলে যাও।

ধারা বিবরণী?

ধরো তাই!

নয়না নড়েচড়ে বসে বলে—আচ্ছা তবে শোনো। হাতে সুপুরি আর পাঁচটা পয়সা আছে?

তার মানে?

মানে জানো না? কোনো মাহাত্ম্যকথা শুনতে হলে হাতে পয়সা-সুপুরি নিয়ে বসতে হয়।

জানতাম না, জানলাম।

আরো কতো জানবে—মুখ টিপে হাসে নয়না, নয়নার চোখের তারাও হেসে ওঠে যেন। তারপর সত্যিই ধারাবিবরণীর ভঙ্গীতে বলে—বাস থেকে তোমাদের বাড়ির মোড়ে নামলাম, গটগট করে এগিয়ে গেলাম দরজার সামনে, গিয়ে কলিং বেল খুঁজলাম, পেলাম না—

আমার ঠাকুর্দার আমলের বাড়িতে তুমি কলিং বেল খুঁজতে বসলে?

নো ডিসটার্ব্যান্স···খুঁজে পেলাম না। তখন সজোরে কড়া নাড়লাম, একটি বালক ভৃত্য এসে দরজা খুলে দিলো। সুরেলা গলায় বললাম, দীপকবাবু আছেন?···বালকটি আকর্ণ হাসি হেসে বললো, মেজমার ঘরের ছোড়দাবাবুতো? বাড়ি নেই। খুব বিস্ময় আর চিন্তার ভান দেখিয়ে বললাম, বাড়ি নেই? আমার যে খুব দরকার ছিলো। বলেছিলেন বাড়িতে থাকবেন—

দীপক দু হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে—উঃ, নমস্যা মহিলা! এসব কি রিহার্সাল দেওয়া ছিলো, না সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হলো?

আবার ডিসটার্ব! বলেছি না শুনে যাও একমনে। বললাম, কতোক্ষণ বেরিয়েছেন বলো তো? বললো, সেই কখন কে জানে—

আরো সুরেলা গলায় বললাম, কখন ফিরবেন জানো? বালক ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভঙ্গীতে হাত উল্টে বললো, ওই ছোড়দাবাবুর কি আর ফেরার টাইমের ঠিক আছে দিদিমণি? নাওয়া খাওয়া ঘুম, এই-টুকুর জন্যেই যা বাড়িতে থাকা। আমি বললাম, সে কী? বাইরে

এতো কী? ছুটির দিনেই-বা কী করেন? ও একগাল হেসে বললো, ওনার কথা বাদ দিন, উনি একটি ছিষ্টিছাড়া।

কী বললো এই কথা হতভাগাটা?

বলবে না কেন? সকলেরই বক্তব্যের স্বাধীনতা আছে। ছেলেটির সত্যকথা বলার সৎ সাহস আছে বলতেই হবে। একটি সৃষ্টিছাড়া জীবকে নিয়ে আমারই যে ভবিষ্যতে কী হবে কে জানে। সে যাক। বললাম, কিন্তু আমার সঙ্গে যে কথা ছিলো একটা বই দেবেন, আচ্ছা বাড়িতে কারো কাছে রেখে গেছেন কিনা জিগ্যেস করে এসো তো।

শুনেই ছুট দিলো, আর বিদ্যুৎগতিতে ফিরে এসে বললো, বাড়ির মধ্যে ডাকতেছে।

…ব্যস, আর আমায় পায় কে? ঢুকে গেলাম, একটি বিবাহিতা মহিলা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে প্রশ্ন করলেন, আপনি ছোট-ঠাকুরপো ইয়ে দীপকের বন্ধু?

বললাম, হ্যাঁ, একসঙ্গে পড়েছি তো? আচ্ছা, ও কি একটা বই রেখে গেছে কাউকে দেবার জন্যে? তিনি মাথা নাড়লেন, তারপর আমার সঙ্গে নানা কথা জুড়লেন। বেশ বুঝলাম আমাদের এই বন্ধুত্বের সম্পর্কটি কতদূর গভীর, কতখানি বিস্তৃত, কতটা ব্যাপক, সেটি জানবার জন্যেই এই পরিশ্রম। আমার অবশ্য তাতে উপকারই হলো, দেখে নিলাম অনেক কিছুই।

মাকে তো দেখনি—

সেই তো। সে সুযোগ হলো না। বলতে তো আর পারি না —মাকে দেখবো। একটা অশরীরী বইয়ের কথাই বলে চলেছি বারবার। কিন্তু বইয়ের মালিক যদি এসে পড়েন, এই আশায় বসছি একটু, এই ভানে কতক্ষণ আর থাকা যায়? চলে এলাম।

দীপক বলে—উঃ, ভাগ্যিস সত্যিই হঠাৎ গিয়ে পড়িনি—

পড়লে কী হতো?

দীপক গম্ভীর হাস্যে বলে—বাড়তি কিছু হতো না, অবশ্য বাড়িসুদ্ধ সকলেই যা বোঝবার বুঝে নিয়েছে।

বুঝে নিয়েছে মানে? কী বুঝে নিয়েছে?

বললাম তো যা বোঝবার।

নয়না চোখ কুঁচকে ভুরু তুলে বলে—তার মানে? একটা মেয়ে তার সহপাঠীর বাড়িতে একটা বই চাইতে গেলেই সবাই সব বুঝে ফেললেন?

ফেলবেন। ওইরকম সূক্ষ্মদৃষ্টি ওনাদের। তাহলেই বুঝতে পারছো কেন এই হতভাগ্য দীপক ঘোষাল আলাদা একখানি ফ্ল্যাটের জন্যে—

নয়না বললো—এটা তোমার স্রেফ শুচিবাই দীপক। ও বাড়িতে থাকা যাবে না এ আবার কেমন কথা? আমার তো সবাইকেই বেশ ভালো লাগলো।

দীপক আরো গম্ভীর হয়ে বলে—এটাও মারাত্মক। ও বাড়িতে আমি বাদে আরো সাঁইত্রিশটি প্রাণী আছে, তাদের সকলকেই যদি বেশ ভালো লাগে তোমার, আমার ব্যাপারটা বেশ সুখের হবে কী?

তোমার মতন হিংসুটের কোনো ব্যাপারেই সুখের আশা নেই।

হাসতে হাসতে উঠে পড়ে নয়না।

বাড়িতে যখন ফিরলো নয়না, তখন সেই হাসির ঝলমলানি লেগে রয়েছে তার গায়ে মুখে চোখের তারায়, ঠোঁটের কোণায়। যেন-বা শাড়ীর ভাজে চুলের খাঁজে।

তেমন বিজ্ঞ দৃষ্টির সামনে পড়লে হয়তো ধরা পড়ে যেতো। এতক্ষণ প্রণয়সান্নিধ্য সুখের স্বাদে বিভোর ছিলো নয়না, একথা লেখা রয়েছে ওর আলোয় ভরা মুখের রেখায়।

কিন্তু নয়নার ভাগ্য যে পড়লো না তেমন দৃষ্টির সামনে। শুধু বাড়ি ঢুকেই নয়না তরুর কাছ থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করলো, বিকেল বেলা নয়নার মা এসেছে, এবং খুব রাগারাগি করেছে।

কার সঙ্গে রাগারাগি?

কারণটা কী?

কারণ জানে না তরু, তবে কার সঙ্গে তা জানে। মাসিমার সঙ্গে।

বুকের মধ্যে উথলে ওঠা সুখের ছলছলানিটা থমকে গেল।

মা এসেছেন, তার মানে নয়নার উপর একরাশ অভিমান অভিযোগ নিয়ে। নয়না কেন যায় না, এতো কাজের মানুষ হয়ে উঠেছে যে, সপ্তাহে একটা দিনও মাকে একবার দেখে আসতে পারে না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেগুলোর জন্যে মনকে প্রস্তুত করে নিলো, কিন্তু পত্রলেখার সঙ্গে কী হলো সেটা বুঝতে পারলো না। দেরী না করে চলে এলো তাড়াতাড়ি, এ ঘরে দরজার কাছ থেকেই বলে উঠলো—মাতৃদেবীর কণ্ঠধ্বনি শুনতে পাচ্ছি মনে হচ্ছে—

মহাশ্বেতা পত্রলেখার চৌকীর উপর বসেছিলো, মহাশ্বেতার হাতে একটা চকচকে কৌটো, মহাশ্বেতার গালে এক গাল পান।

মা আবার পান খেতে শিখলো কবে থেকে? ভাবলো নয়না। কই আগে কি দেখেছে কোনোদিন নয়নার মা পান খাচ্ছে, এটা তাহলে মায়ের উপর শ্বশুরবাড়ির প্রভাব।

নয়না তাই ঘরে ঢুকেই বলে উঠলো—এঃ মা, তুমি আবার পান খেতে শিখলে কবে থেকে? আগে তো খেতে না!

কথাটা অবশ্যই খুব ভালো লাগলো না মহাশ্বেতার।

মহাশ্বেতা বেজার গলায় বললো—তবু ভালো যে মা কী করতো না করতো তা মনে আছে।

নয়না চৌকীর একধারে বসে পড়ে বড় একটা নিশ্বাস ফেলে বলে—আমি বেশ একটা মজার দেশে বাস করছি, কী বলো মাসিমণি? সেই যে যে দেশে জিলিপি সে তেড়ে এসে কামড় দিতে চায়। কচুরী আর রসগোল্লা ছেলে ধরে খায়—মা নিজে সন্তানকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়ে, তার বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার চার্জশীট তৈরী করে।

মহাশ্বেতা ফোঁস করে বলে ওঠে—একথা তো মুখের বুলি। বলি আমি তোকে ত্যাগ করেছি? যা করেছি তা তোর ভালো ভেবেই করেছি, কিন্তু এখন তো দেখছি ভুল করেছি। মাথার ওপর

ওই দাদু আর চোখের ওপর এই মাসি থাকতেও তো উচ্ছন্নে যেতে বাকি থাকছে না।

নয়না মার বিরক্তে লাল হয়ে ওঠা মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে বলে—উচ্ছন্ন গেছি সে খরবটা তাহলে পেয়ে গেছো?

মহাশ্বেতা বলে—খবর কখনো চাপা থাকে না। তুমি একটা ছেলের সঙ্গে সর্বদা পথেঘাটে ঘুরছো, চায়ের দোকানে ঢুকে চা খাচ্ছো, এসব লোকের চোখ এড়ায়? কেউ তো চোখ বুঁজে চরে বেড়ায় না। সে যদি বলো তো তোমার এই মাসি আর দাদুই বেড়িয়েছেন। দু চোখ বুঁজে বেড়িয়েছেন।

নয়না আরো গম্ভীর হয়ে যায়, বলে—কতকগুলো বাজে কথা বলতে বসেছো কেন?

বাজে কথা? তুই কোন ছেলের সঙ্গে ভাব করিসনি?

একটা ছেলের সঙ্গে কেন? অনেক ছেলের সঙ্গেই করেছি—নয়না দৃঢ় গলায় বলে—ইউনিভার্সিটিতে একসঙ্গে পড়াশোনা করেছি, ভাব না হওয়াই তো আশ্চয্যি। নয়না খুব শান্ত আর দৃঢ় গলায় বলে—ওদের মধ্যে থেকেই একজনকে বিয়ে করবো ঠিক করেছি—

পত্রলেখা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—আচ্ছা, ওসব কথা বলার সময় পালাচ্ছে না, এখন হাত-মুখ ধো, কিছু খা। মা মালপো করে এনেছে—

নয়না মৃদু হেসে বলে—মায়ের হাতের তৈরী মালপো যখন বাড়িতে এসে গেছে, তখন সেও পালাচ্ছে না। মাই বরং পালাবেন, অতএব কথাটাই হয়ে যাক।

পত্রলেখা হালকা গলায় বলে—আরে বাবা, তোর মাও আজ পালাচ্ছে না, রাত্রে থাকবে।

মায়ের অসীম করুণা, কিন্তু মা থাকলেও পরিস্থিতিটা পালাবে মাসিমণি, প্রসঙ্গটিকে আবার তাক থেকে পেড়ে নামাতে হবে। এখনই বলে ফেলা ভালো। তোমাকেই বলি মা, তোমরা আমায় তোমাদের আমলের মতো বোরখা পরিয়ে মানুষ করোনি, নাবালিকা

বয়েসেই একটা বিয়ে দিয়ে বাড়িছাড়া করোনি, আর পাঁচজনের মতোই বাইরের জগতে চরে বেড়াতে দিয়েছো, সাবালক হতে দিয়েছো, চোখ-কান খুলে পৃথিবীকে দেখতে দিয়েছো। এখন যদি আমার কাছে তোমাদের আমলের ব্যবহার প্রত্যাশা করো ভুল হবে। আমার যদি কোনো বন্ধুকে ভালো লেগে যায়, যদি মনে হয় তার সঙ্গে বিয়ে হলে আমি সুখী হবো, তাহলে আমার হাতেই ছেড়ে দাও সেটা। একে যদি উচ্ছন্ন যাওয়া বলে, তো গেছি উচ্ছন্ন।

মহাশ্বেতা রুদ্ধকণ্ঠ বলে—দিদি, এরপরও তুই বলবি, নয়না আর যাই করুক অন্যায় কিছু করবে না। গুরুজনের মুখের ওপর এই-রকম ভাষা?···নিজের বিয়ের কথা নিয়ে এইরকম চোটপাট? আমার ও বাড়ির মেয়েরাও এভাবে কথা বলতে লজ্জা পাবে। অথচ আমি তাদের সংস্রব থেকে সরাতেই—

মহাশ্বেতা ক্ষোভের গলায় বলে—যাক, ভগবান ভালোই শিক্ষা দিলেন। তা আর আমার থাকার দরকারটা কী? ভেবেছিলাম সময় হাতে নিয়ে বোঝাবো পড়াবো, সে আশা আর নেই বুঝতে পারছি, তাহলে চললাম।

পত্রলেখা বলে—অতোই-বা রেগে যাচ্ছিস কেন মহা? ছাখ না ছেলেটিকে? অপছন্দের হবে না—

মহাশ্বেতা গায়ে জড়ানো চাদরটা আরো ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বলে—মোটেই এটা রাগের কথা নয় দিদি, কথা হচ্ছে মান-সম্মানের। আমার মতে এটা হচ্ছে গুরুজনের অপমান।

পত্রলেখা আপোসের সুরে বলে—ওভাবে ভাবছিস কেন মহা? তুই তো মেয়ের সুখই চাস? ও যদি মনে করে এতে ও সুখী হবে—।

মহাশ্বেতা তীক্ষ্ণ হয়—থাক দিদি, ওসব জ্ঞানের কথা ঢের শোনা আছে। সুখ! মাতালরা তো মদ খেতে খুব সুখ পায়, সেটাও তাহলে তুই সমর্থন করবি? এসব ছেলেমেয়ের অবস্থা হচ্ছে মাতালের অবস্থা বুঝলি? ভেবেছিলাম একটা আদর্শের মধ্যে মানুষ হচ্ছে

সংযমের শিক্ষা হবে, সভ্যতার শিক্ষা হবে। হলো না। রক্তের গুণ যাবে কোথায়? স্বেচ্ছাচারী বংশের সন্তান; যা মন হবে তাই করবে। এই তো ছিলো বাপের মতিগতি। অথচ এমন মনে হতো যেন কিচ্ছু দোষ করছে না—

নয়না মৃদু হেসে বলে—যা মনে হতো সেটাই ঠিক। দোষ সকলের গায়ে সমানভাবে লাগে না মা। রূপোর বাসনে কলঙ্ক পড়ে না। এই যে তুমি পতিব্রতা হিন্দু নারী হয়েও চিরদিন পতিনিন্দা করে এলে, লোকটা মরেও তোমার হাত এড়াতে পারলো না, তুমি কি ভাবছো এতে তোমার দোষ লাগছে? ভাবছো না তো? অথচ—

মহাশ্বেতা আর কথা বলে না, মুখ ঘুরিয়ে ডাক দেয়—সুশীল।

সুশীল মহাশ্বেতার এক অনুগত ভাগ্নে। মামীকে ঘাড়ে করে বয়ে বেড়ানোর গুরুভার সে স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছে।

ওরা চলে গেলে পত্রলেখা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে—চিরকাল তোর এক অভ্যেস গেল। মাকে রাগিয়ে কী সুখ পাস?

নয়না অপ্রতিভ হাসি হেসে বলে—কি জানি। মাকে দেখলেই যে কেন রাগাতে ইচ্ছে করে—

পত্রলেখা বলে—ঠিক বাপের স্বভাবটি পেয়েছো আর কি! তার তো ওই ছিলো মজা!

আজ কিন্তু তোর মা সত্যি রেখে গেছে—

নয়না নিশ্চিন্তের গলায় বলে—ওর জন্যে ভেবো না খড়ের আগুন। দেখো দু-দিন পরেই মেয়ের বিয়ের গয়না গড়াতে বসবে। ভাবনা হচ্ছে দাদুকে নিয়ে। হঠাৎ যদি বলে বসেন, না এ বিয়ে করা চলবে না তোমার—তাহলেই তো গেছি।

পত্রলেখা ওর মুখের দিকে একটু স্থিরভাবে চেয়ে থেকে বলে—আচ্ছা নয়না, বাবা যদি সত্যিই তা বলেন কী করবি তুই?

নয়না শান্ত গলায় বলে—সত্যিই যদি একেবারে স্পষ্ট করে বারণ করেন, তাহলে আর কী করবার থাকবে বলো?

হ্যাঁ, বলেছিল নয়না একথা।

শুধু মুখের কথায় নয় বিশ্বাসের সঙ্গেই বলেছিল। বিধুশেখর যদি স্পষ্ট করে বারণ করে বসেন, নয়নার হাত-পা বন্ধ।

কিন্তু নয়নার ভাগ্য নয়নার হাত-পা বন্ধ করলো না।

বিধুশেখর বারণের দিক দিয়ে গেলেন না।

বিধুশেখর ওকে ঘরে ডাকিয়ে প্রথম প্রশ্ন করলেন—তোমার রিসার্চের কতদূর ?

নয়না এটা ভাবেনি, তাই নয়না একটু থতমত খেলো। তারপর বললো—হয়েছে অনেকটা। আপনি যতোখানি দেখেছিলেন, তারপর আরো কয়েকটা চ্যাপ্টার লিখেছি। দেখানো হচ্ছে না।

বিধুশেখর গম্ভীর হাস্যে বলেন—না হওয়াই স্বাভাবিক, সময়টাকে নানাদিকে ব্যয় করতে হচ্ছে। তাহলেও আশা করছি ঠিক সময়ের মধ্যে করে তুলতে পারবে। প্রয়োজন মতো বইটই পাচ্ছো তো ?

নয়না নয়ন না তুলেই বলে—এখনো তো অসুবিধে বিশেষ হয়নি। ব্রিটিশ কাউন্সিলে তো যাচ্ছিই, মাঝে মাঝে সাহিত্য পরিষদেও যাই। একটু হেসে বলে—আপনার সংগ্রহশালাটিও নেহাৎ কম নয়—

বিধুশেখর এ কথায় উৎফুল্ল হন না বরং ঘরের দেওয়ালের পা থেকে মাথা পর্যন্ত গাঁথা বই ঠাসা র‍্যাকগুলোর দিকে একবার চোখ ফেলে হতাশ গলায় বললেন—তবু, কখানা বইই-বা কিনতে পেরেছি জীবনে। স্থানাভাব অর্থাভাব সবদিকেই অভাব। বাসনাকে নিবৃত্ত করতে ওর তুল্য শক্তিশালী প্রতিপক্ষ আর কেউ নেই।

ছেলেবেলা থেকে কেবল বইয়ের লিষ্টই তৈরী করেছি, আর ভেবেছি, সময় এলে কিনবো এগুলো। তেমন সময় আর এলো কই ?

আমার কিন্তু ভাবলে অবাক লাগে দাদু, এই এতো সব বই আপনি পড়ে ফেলেছেন। শুধু পড়া নয়; প্রায় মুখস্থ করে ফেলা।

বিধুশেখর মৃদু হেসে বললেন—ওটা কিছুই নয়, সবই অভ্যাসের

ব্যাপার। তোমরা মেয়েরা যতোরকম রান্নাটান্না খাবারটাবার তৈরী করো তার পদ্ধতি, আর যতোরকম মশলাটশলা ব্যবহার করো তার নাম বলতে বসো, শুনলে আমার মাথা ঘুরে যাবে। অথচ তোমাদের কাছে ওটা একটা ব্যাপারই নয়। কতো অবলীলায় মনে রাখো, মুখস্থ রাখো। কিন্তু ও কথা থাক; তোমায় যে জন্যে ডেকেছি, প্রশ্ন হচ্ছে তুমি কি তোমার থিসিসটা সাবমিট করার অগেই বিবাহের দিন স্থির করতে চাও, না ওটা কমপ্লিট করা পর্যন্ত স্থগিত রাখতে চাও?

ওরে বাবা! এ কী প্রশ্ন!

অকস্মাৎ যেন একটা ইঁট পড়ে নয়নার মাথায়।

নয়না কি এরকম সরাসরি আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিলো?

কিন্তু এতে দুঃখিত হলে চলবে না নয়নার। যে মুহূর্তে সে নিজেকে সাবালিকা বলে দাবি করেছে সেই মুহূর্তেই নিজের সব দায়িত্ব তার উপরে পড়ে গেছে। এখন আর নয়নার বললে চলবে না 'বাঃ, ওসবের আমি কি জানি!'

তবু নয়নার হঠাৎ খুব দুঃখ হলো।

নয়নার যেন ভিতর থেকে একট কান্না ঠেলে উঠলো।

নয়নার যেন একটু অপমান অপমান লাগলো। না হয় প্রেমেই পড়ে বসে আছে, তাই বলে কি এদের কাছে এমন কোনো ভাব দেখিয়েছে যে বিয়ের জন্যে মরছে সে?

অবশ্য মরছে না তা বলা যায় না। 'এভাবে আর ভালো লাগছে না' বলে বলে জ্বালিয়ে মারছে দীপককে, কিন্তু এঁদের সঙ্গে সে কথার কী সম্পর্ক? এঁদের কাছে তো এই সবেমাত্র প্রকাশ করেছে যে সে তার পাত্র নির্বাচনের কাজটা সেরে ফেলেছে। আর কিছু বলেছে?

তবে?

তবে হঠাৎ দাদুর এরকম কথার মানে?

ভারী অভিমান হলো নয়নার, আর সেই অভিমানের বশে নিজের ইচ্ছার প্রতিকূলে কথা বলে বসলো। বললো—ওটা সাবমিট করার আগে কিছু হতে পারে না।

শুনে যেন বিধুশেখর বিশেষ প্রসন্ন হলেন।

ইতিপূর্বেই যে অপ্রসন্নতা দেখিয়েছেন তা নয়, ওঁর প্রসন্নতা অপ্রসন্নতার মাঝখানে টেউয়ের খাঁজ নেই।

বিধুশেখর যেন নিখাঁজ-নিভাজ-তবু এখন যেন প্রসন্নতার রেখা ফুটে উঠলো মুখে।

বললেন—এটা যদি ঠিক করে থাকো, ভালোই। একটা বড়ো কাজে যখন হাত দিয়েছো—আর একটা কথা, ছেলেটি কি তোমাদের সঙ্গেই পাশ করে বেরিয়েছে?

নয়না টেবিলের একখানা বই তুলে নিয়ে ওল্টাতে ওল্টাতে বলে —হ্যাঁ।

ভাবলো একবার নিশ্চয় নাম জিগ্যেস করবেন দাদু, কারণ পদবী সম্বলিত নামের মধ্যেই প্রায়শঃই ধরা পড়ে ব্রাহ্মণ না বৈদ্য, কায়স্থ না অন্য কিছু।

কিন্তু বিধুশেখর তা জিগ্যেস করলেন না। বিধুশেখর শুধু বললেন —ছেলেটিকে কি সর্বাংশে যোগ্য বলে মনে হয়েছে তোমার?

নয়নার অভিমান আবার উথলে ওঠে।

দাদুর কথার ধরণ অবশ্য এইরকমই নির্লিপ্ত নির্লিপ্ত। তবু এখন যেন বড়ো বেশী নির্লিপ্ত আর বিমুক্ত মনে হলো দাদুকে।

এ রকমটা ভাবেনি।

ভেবেছিলো, নিজে থেকে দাদুকে জানাবে, তুতিয়ে পাতিয়ে মন গলিয়ে অনুমতি আদায় করে নেবে, তারপর দীপককে এনে সামনে ধরে দেবে। দাদুর সঙ্গে দীপককে পরিচিত করাবার সময় কেমন দৃশ্যটি হবে, সেটাই মনে মনে ভেঁজেছে বারে বারে নানাভাবে, ছবির মতো এঁকেছে, সে ছবি গেল ভেস্তে। হয়তো নিয়ে আসার কথা তুললে বলবেন, 'আমার আর দেখার কী দরকার? তুমি তো দেখেছো—'

ঠিক আছে, নয়নাও নির্লিপ্ত হবে।

নয়না দাদুর প্রশ্নের উত্তরে অবহেলার ভঙ্গীতে বললো—এম-এসসি ফাইন্যালে তো ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হয়েছে—

বিধুশেখর একটু হাসলেন, বললেন—ভালো কথা। কিন্তু জীবনটাকে তো তুমি শুধু ডিগ্রীর সঙ্গে জুড়ে দেবে না? দেবে একটা জীবের সঙ্গে। তার আচার আচরণ রুচি প্রকৃতি মানসিকতা তোমার সব কিছুর সঙ্গে খাপ খায় কিনা, সেটা তো দেখা দরকার।

নয়না দাদুর এই হাসি দেখে কিঞ্চিৎ স্বস্তি পেয়ে নিজেও হাসলো —এতো সব মিলিয়ে কি আর সবাই পায়?

পায় না ঠিকই।—বিধুশেখর গম্ভীর হাস্যে বলেন—হয়তো ওর একটাও পায় না, কিন্তু সেটা হলো নিয়তির হাতে আত্মসমর্পণ, কিন্তু তুমি যখন স্বয়ংবরা হতে যাচ্ছো, তখন তো এগুলো দেখবে?

নয়না এখন ওর দাদুর চোখের দিকে চোখ তুলে একটু বিচিত্র হাসি হেসে বলে—আর আমি যদি বলি এটাও নিয়তি।

বিধুশেখরের মুখটা আর একবার প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হলো, বললেন —সেটা যদি সত্যিই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করো তাহলে ভাবনার কিছু নেই। তবে একটা প্রশ্ন—সহপাঠী যখন, তখন অবশ্যই বয়েস সমান, কম হওয়াও অসম্ভব নয়, এতে কোনো অসুবিধে বোধ করবে না তো?

নয়না অবাক গলায় বলে—অসুবিধে কি?

অসুবিধে এই, 'স্বামী' শব্দটা যে অর্থবাচক, তাতে তো ধরে নেওয়া উচিত তার কাছে তোমার আশ্রয় তোমার নিরপত্তা তোমার নির্ভরতা। একটি সমবয়সী ছেলের কাছে থেকে এটা কী পাওয়া সম্ভব?

নয়না হেসে ফেলে, বলে—ওটা পাওয়া না পাওয়া তো যার যার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে দাদু! ডবল বয়েসের লোকের কাছেও যে সবসময় এসব পাওয়া যায় তাও তো নয়। বলুন, পাবার গ্যারান্টি আছে?

বিধুশেখর তর্ক থেকে সরে এলেন, বললেন—এই অনিত্য সংসারে কিসেরই-বা গ্যারান্টি আছে বলো?

তারপর একটু হাসলেন—আর কিছু না হোক, বছর দশেক পরে

তুই একখানা মুটকী দজ্জাল গিন্নী হয়ে যাবি, আর সে ভদ্রলোক ছেলেমানুষ থেকে যাবে—

নয়নার বুঝতে ভুল হয় না এই পরিহাসটুকু দাদুর করুণা। প্রথমটায় যে একটু কঠিন হয়েছিলেন, তার জন্যে মমতা বোধ করলেন।

নয়না মুখ নীচু করে হাসি লুকিয়ে বলে—বয়েস একলা আমারই বাড়বে?

বিধুশেখর বললেন—মেয়েদের তো শুনেছি বছরে দু'বার বয়েস বাড়ে।

তারপরই ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বলেন—মহা আজকে থাকবে বলে এসে চলে গেছে শুনলাম—

নয়না মাথা নীচু করে বলে—আমার উপর রাগ করে চলে গেছেন—

মাকে সবসময় রাগাও কেন?

নয়না বলে—বুঝতে পারি না দাদু. কতোদিন ভেবেছি আর কক্ষনো এমন কাজ নয়, কিন্তু মাকে দেখলেই কী যে হয়—

বিধুশেখর আস্তে বলেন—বেচারা বড়ো নির্বোধ। ঠাট্টাতামাসা বোঝে না। নইলে নিশিনাথের মতো স্বামী পেয়েও—আচ্ছা দিদি, আমি এখন নিজের কাজ করি।

নয়না তাড়াতাড়ি উঠে পড়েই কাছে এসে বিধুশেখরের পায়ের কাছে নীচু হয়ে প্রণাম করে চোখ তুলে বলে—প্রসন্ন সম্মতি পেলাম তো দাদু?

বিধুশেখর চোখ বুঁজে কী আশীর্বাদ করলেন কে জানে। মুখে বললেন—না পেয়ে কি ছাড়তে তুমি?

নয়না ঘরে এসে ভাবলো, এইবার আমার দশা হলো ভালো। এখন হয়তো দীপক তাড়া লাগাবে আর আমায় বলতে হবে, 'রোসো, আমার থিসিসটা আগে শেষ করি।' হঠাৎ নার্ভাস হয়ে গিয়ে কী যে বলে বসলাম!

তবে ওটা না বলে 'এক্ষুনি বিয়ে করতে চাই' বললে বিধুশেখর ভট্টাচার্য আমায় ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন। ওঁর কাছে আমি পতিত হয়ে যেতাম।...

এই হলো পূর্বকথা—

এইভাবে বিয়ের সম্মতি আদায়।

দীপককে অবশ্য অতো কিছু করতে হয়নি। নয়না ওদের বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার দিন থেকেই সবাই ধরে নিয়েছে ওই মেয়েটার সঙ্গেই লটকেছে হতভাগা ছেলেটা।

আপাততঃ চলছে এই অবস্থা—নয়না ওর কাজটা শেষ করার জন্যে প্রাণপণে খাটছে আর দীপক প্রাণপণে মনের মতো ফ্ল্যাট খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং কর্মক্ষেত্রে উন্নতির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

অবশ্য ছোট্ট আরও একটি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো তলে তলে। সেটা জানতে পারলো নয়না একেবারে তার সাফল্যের দিন। সাফল্যর মূর্তিটিকে নিয়ে হাজির হলো দীপক। নয়না লাফিয়ে উঠে বললো—এর মানে? তারপর আহ্লাদে আর আবেগে, অভিমানে আর রাগে হঠাৎ দুম দুম করে দু-চারটে কীল বসিয়ে দিল দীপকের পিঠে।

দীপকও আহ্লাদে আবেগে বিচলিত হচ্ছিল বৈকি। কোন্ লেখক তার জীবনের প্রথম বই প্রকাশের দিন পুলকে বিচলিত না হয়?

নয়নার হাতের কীল খেয়ে আরো হলো, বললো—এই আমার পুরস্কার?

নয়না বললো—এছাড়া আবার কী আশা করেছিলে? নেহাৎ পার্ক বলে তাই অল্পের ওপর দিয়ে গেলো। কেন, কেন তুমি আমায় বলোনি তোমার বই ছাপা হচ্ছে?

দীপক একটু হেসে বললো—আমাদের সেকেলে সংসারে অনেক প্রবাদ চালু আছে। প্রায়ই শুনতে পাই 'না আঁচালে বিশ্বাস নেই'। এই বইটা সম্পর্কে সেই কথাটা মনে রেখেছিলাম।

সে তুমি অন্য যার কাছে মনে রাখো রাখো, তা বলে আমার কাছে? ইস্! কী ভালো যে লাগছে আমার, আর কী রাগ যে হচ্ছে!

দীপক বললো—চমৎকার! কতো চেষ্টায় কতো সাধনায় কতো স্বপ্নে কতো শ্রমে জলজ্যান্ত একখানা বই বার করে ফেললাম, আর তোমার রাগ হচ্ছে?

হচ্ছে, হচ্ছে, একশোবার হচ্ছে—নয়না অভিমানে ছলছলিয়ে বলে—আমিও তোমার এই সমস্তরই ভাগীদার হতে পারতাম না বুঝি? আমি কতোদিন ভেবেছি তোমার যখন প্রথম বই ছাপা হবে কবিতা বাছাইয়ের কাজটা আমার হাতে রাখবো, মলাটের ছবি আমি পছন্দ করবো, নামকরণ হবে দুজনার পরমর্শে আর দুজনে একসঙ্গে প্রতীক্ষার দিন গুনবো, আর তুমি কিনা—গুনে গুনে একশোটা কীল মারা উচিত তোমায়।

প্রথম উচ্ছ্বাসের চেহারাটা হলো এই।

আবার নয়না তক্ষুনি বইয়ের মলাট উল্টে বললো—কই উৎসর্গ পৃষ্ঠা দেখছি না যে? প্রথম বই কাউকে উৎসর্গ করলে না?

দীপক নয়নার বইধরা হাতের ওপর হাত রেখে বললো—তাই কখনো হয়?

কই? কোনোখানে তো দেখছি না!

আছে। খুঁজে বার করো—

আমার অতো ধৈর্য নেই।—নয়না অধীর গলায় বলে—অদৃশ্য কালিতে ছেপেছো নাকি? কাকে উৎসর্গ করা হয়েছে শুনি?

দীপক গম্ভীর গলায় বলে—কাকে মনে হয়?

বাঃ, তা কী করে জানবো? নয়না নিরুত্তেজ গলায় বলে—প্রথম বই তো অনেকে মা-বাবাকেও দেয়।

এ রকম কড়া প্রেমের কবিতা দেয় না।—বলে উৎসর্গ পৃষ্ঠা খুলে ধরে দীপক।

বইয়ের ঠিক মাঝখানের ফর্মার মাঝামাঝি একখানা নিপাট শাদা

কাগজ, তার একেবারে নীচের দিকে ছোট্ট অক্ষরে উৎসর্গের ভাষা—'তোমাকে—'

নয়না কয়েক সেকেণ্ড সেই অক্ষর তিনটির দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে বলে—এটা খুব মৌলিক করেছো বলতেই হবে। তা এই—'তুমিটি' কে?

আছে একজন—বলে দীপক ওর পিঠে হাত রেখে একটু কাছে টানতে চায়।

নয়না নিজেকে শিথিল করে না, শান্ত গলায় বলে—এখানে সহস্র লোক, এখানে সহস্র চোখ, এখানে ওসব কিছু নয়।

আমাদের ভাগ্যে তো সর্বত্রই সহস্র লোক, সহস্র চোখ।

আমাদের মতন শিক্ষানবীশদের সকলের ভাগ্যেই ওই, দীপক!

তারপর আবার বইটার গায়ে হাত বুলিয়ে বলে—নাঃ, তোমার রুচি আছে দীপক। নিন্দে করবার কোনো স্কোপ পাচ্ছি না। আমার কল্পনার সঙ্গে মিলেই যাচ্ছে—

দীপক অপ্রতিভ মুখে বললো—আসলে কী জানো? বোকার মতো ভেবেছিলাম তোমায় একটা সারপ্রাইজ দেবো। এখন দেখছি—সত্যিই ভারী অন্যায় হয়ে গেছে।

দীপকের অনুতাপ দেখে উদ্বেলিত নয়না শান্ত হয়ে গেল একটু।

বদলে গেলো তখন। নরম চোখে চাইলো।

বললো—আচ্ছা থাক, যথেষ্ট হয়েছে। দেখেই বুঝেছি, আসলে তুমি কী ভেবেছিলে।...তা দিলে বটে একখানা সারপ্রাইজ সত্যি একটুও জানতাম না তো! এতো অদ্ভুত ভালো লাগছে!

ভালো লাগছে?

লাগছেই তো! সাংঘাতিক ভালো লাগছে—নয়না ছেলে-মানুষের মতো বারবার বইটার গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখে বলে—সত্যি বলতে কিন্তু আমার কল্পনায় ঠিক এই রকমই ছিলো!

উল্টেপাল্টে দেখে উচ্ছ্বসিত গলায় বলে—এই কবিতাটা

দিয়েছো? এইটা? এইটা? ইস্! ঠিক এইগুলোই আমি ভেবে রেখেছিলাম—বাছাই করতে পেলে আমি এইগুলোই—

দীপক বলে—আসলে তো সবই তোমারই নির্বাচন। তুমি যখন যেটাকে পাশ মার্ক দিয়েছো, সেটাই চিহ্নিত করে রেখেছি। মলাট সম্পর্কেও তোমার আইডিয়া জানা ছিলো। তুমি বলেছিলে—প্রথম বইয়ের মলাট কক্ষনো বেশী রংচং-এ কোরো না। নো ডিজাইন, নো ত্রিবর্ণ রঞ্জিত। মাত্র একটাই রং থাকবে হালকা নীল রং। তার উপর শুধু শাদা রং-এ মোটা তুলিতে নাম। নামও বলেছিলে—শাদা মেঘের ভেলা, মনে আছে?

হুঁ।—বললো নয়না।

তাই রাখছিলাম—দীপক কুণ্ঠিত গলায় বলে—পাবলিশারের পছন্দ হলো না, বললো নামটা অনাধুনিক।

নয়না রেগে প্রশ্ন তুললো—বাঃ, তাতে ওর কী? তোমার বই তুমি যা খুশি নাম রাখতে পারো—।

দীপক মাথা নেড়ে বলে—তা নয় হে মহিলা! নতুন কবির অতো ডাঁট দেখালে চলে না, ছাপছে এই ঢের। নেহাৎ না কি কয়েকটা নামকরা পত্রিকায় ছাপা হয়েছিলো তাই ছাপতে রাজী হলো। নামের ব্যাপারে বললো—আপনার ছেলের আপনি যা খুশী নাম রাখতে পারেন, কিন্তু বইয়ের নামকরণে পাবলিশারের পরামর্শ নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

নয়না আর একবার বইটা খুলে তার পাতায় আলতো করে হাত বোলাতে বোলাতে বলে—অবশ্য এ নামটাও খারাপ নয়। 'হে ঈশ্বর, তোমার যবনিকা'—সেনটেন্সটা শেষ না করাই তো দেখি আধুনিকতা। তা কথাতেই হোক, আর বইয়ের নামেই হোক।···হে ঈশ্বর, তোমার যবনিকা। নাঃ, বেশ ভালোই। আধুনিকতা জিনিসটা প্রথমটায় অদ্ভুত লাগে, বাজে লাগে, আবার বারবার দেখতে দেখতে ভালো লেগে যায়।

পার্কে এদিকে ওদিকে নানান লোক, কোনো বেঞ্চেই জায়গা

নেই, কোনো গাছতলায় খালি নেই। ভাগ্যক্রমে একটু আগে আগে আসার দরুণ এরা একটা গাছতলা পেয়ে গিয়েছিলো। কিছুটা জনবিরল। দীপক সেই সুযোগটা নিলো, নয়নার হাতটা বই থেকে তুলে নিয়ে নিজের গালে চেপে বললো—হাতটা যদি বোলাচ্ছোই তো বাজে জায়গায় খরচ করছো কেন ?

নয়না চোখ তুলে একটু তাকিয়ে বললো—বইটার পাতাগুলোকেই তোমার গাল ভাবা যাচ্ছিলো—

নয়না !

উঁ।

কী ইচ্ছে করছে জানো।

নয়না ঘাড় কাৎ করে বললো—জানি।

কচু জানো। বলো তো কী ইচ্ছে করছে ?

কিসে আদর করতে।

দীপক উচ্ছ্বসিত গলায় বলে—নয়না, বুঝতে পারছো তুমি ?

না পারবার কিছু নেই। তোমার না এখন যা মুখচ্ছবি, দেখলে নেহাৎ হাবাগোবাও বুঝতে পারতো তোমার কী ইচ্ছে করছে।

নয়না, ইচ্ছে পূরণের কোন আশা নেই না ?

আপততঃ তো দেখছি না।

দূর কী যে ছাই এ এক প্রমিস করে বসলে বুড়ো ভদ্দরলোকের কাছে !

তোমারও কিছু কম প্রতিজ্ঞা নেই।

ও হয়ে যাবে। জানো শুভঙ্কর একটা বাসার আশ্বাস দিয়েছে—।

নয়না হেসে বলে—অনেক ভয়ঙ্কর, প্রলয়ঙ্কর। কঙ্কর তোমাকে এযাবৎকাল অনেক আশ্বাস দিয়ে আসছে—।

এই না-জানো সত্যি ও বলেছে, ওর নিজের পিসেমশায়ের একটা ভাড়াটে ফ্ল্যাট সামনের মাস থেকে খালি হবে—

হোক। ততোদিনে আমিও আমার পেপার কমপ্লিট করে ফেলতে পারবো আশা করছি।

নয়না। কী ভীষণ যে ভালো লাগছে, এখন আর কী খারাপ যে লাগছে তোমায় ছুঁতে না পাওয়ায়—।

নয়না ওর একটা হাত দু হাতের মধ্যে নিয়ে একটু চাপ দিয়েই ছেড়ে দিয়ে বললো—আমারও।

এখন আমরা কী করবো? দীপক বললো—মানে দীপক ঘোষালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষে?

নয়না বললো—সেটাই ভাবছি। তুমিও ভাবো।

কফি হাউস ছাড়া আমার তো আর কিছু মনে আসছে না—

দূর! বাজে, পচা!···আচ্ছা ক' কপি বই দিয়েছে তোমাকে?

দীপক প্যাণ্টের পকেট থেকে আরও একবার সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে বললো—আপাততঃ তিরিশখানা—

তি-রি-শ! অনেক দিয়েছে তো! তাও আপাততঃ?—নয়না বললো—এই সাহিত্যকুঞ্জ প্রকাশনী তো বেশ ভালোই বলতে হবে।

দীপক সিগারেটটা ধরিয়ে প্রথম ধোঁয়াটা ছেড়ে বললো—ওই বইই কয়েক কপি বাগিয়েছি, আর তো কিছু দেবে না।

ঠিক আছে—নয়না চট করে উঠে দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করলো—নয়না আর দীপক দুজনে এক সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বিশেষ বিশেষ বন্ধুদের বাড়ি গিয়ে 'হে ঈশ্বর, তোমার যবনিকা' উপহার দিয়ে আসা হোক। নয়নার মনে হচ্ছে এটাই হবে সব থেকে সুন্দর উদ্বোধন উৎসব।

কিন্তু দীপক প্রস্তাবটার কিছু খুঁৎ বার করলো, প্রধানতঃ এই সন্ধ্যার সময় হয়তো কাউকেই বাড়িতে পাওয়া যাবে না, তা ছাড়া সময়ই-বা কতটুকু হাতে পাওয়া যাচ্ছে? বন্ধুরা তো সবাই দীপকদের সুবিধে করতে পাশাপাশি বাড়ি বানিয়ে বাস করছে না? কেউ টালায়, কেউ হাজরায়, কেউ বেহালায়, কেউ বেলেঘাটায়। অতএব

আসলে হবে এই যে একজনের উপহারটাই সারা হবে কারণ সেখানে চা খেতে হবে, গল্প করতে হবে, অর্থাৎ শেঁকড় গজিয়ে যাবে।...

অনেককে একসঙ্গে দেবার একটা মস্ত সুবিধা রয়েছে, কদিন পরেই ওদের ইউনিভার্সিটিতে 'রি-ইউনিয়ন'। আশা করা যায় অনেকেই আসবে।

দীপক বললো—রত্না-শান্তনু বলছিলো সেদিন, এবার নাকি বিশেষ ঘটা আছে, বিশেষ ভাষায় রচিত হচ্ছে আমন্ত্রণপত্র।

নয়না এতে রাজী হলো কারণ দীপকের যুক্তিতে ভুল নেই।

নয়না বললো—রত্না আর শান্তনু এখনো সেইভাবেই আছে? তেমনি একসঙ্গে ঘোরে?

তাই তো দেখি।

সত্যিই দুজনে বিয়েটিয়ে করবে না?

তাই তো বলে। তবে মানে হয় না কিছু। নিজের বোন তো আর নয়, সহোদর বোন? তবে আর দ্বিধা কি বাবা? বিয়েটা করে ফেললেই হয়।

নয়না এ কথায় সমর্থন করলো না।

নয়না বললো—দেখতে দৃষ্টিকটু, শান্তনুর মামার বাড়িটা শ্বশুরবাড়ি হয়ে যাবে। কী বিশ্রী, তাছাড়া সব ভালোবাসাই এক নয়, তারও শ্রেণীভেদ আছে।

দীপক উদাস গলায় বলে—কি জানি। তোমারই সাবজেকট, তুমিই বোঝো ভালো।

আমার সাবজেকট মানে?

বাঃ, তোমার নয়? ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানে ওই শ্রেণীভেদ নিয়েই তো কারবার তোমার।

সমাজবিজ্ঞানে শ্রেণীভেদ, প্রেমবিজ্ঞানে নয়।

ও একই।

নয়না বললো—বললেই তো হয় না। ও আলাদা। যাকগে ও কথা, এখন ওঠা যাক।

এক্ষুনি ?

বাঃ, কিছুই যখন হচ্ছে না এখন তখন বাড়ি ফিরে কাজ করাই ভালো।

কাজ না করাটা যে আরো কতো ভালো নয়না, তুমি কোনোদিন জানলে না। কাজ সম্পর্কে বড্ড সিরিয়াস্ তুমি।

কী যে বলো দীপক, আমি দারুণ ফাঁকিবাজ। বরং ঠিক করছি আর এতো ফাঁকি মারবো না।

ওরা উঠলো।

দীপক বললো—শুনতে পেলে ?

কী শুনতে পাবো ?

গাছটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো।

বেশীক্ষণ ফেলতে হবে না, এক্ষুনি আবার কোনো যুগল হৃদয়ের স্পর্শ পাবে। হয়তো আশেপাশে কোথাও ওঁৎ পেতে আছে সেই হৃদয়ের অধিকারীরা।—বলে হাসতে হাসতে এগিয়ে চললো নয়না।

দীপক দুষ্টুমী করে বলে উঠলো—এই নয়না, অতো তাড়াতাড়ি হাঁটছিস কেন ? আমি ভাবছিলাম তোর হাত ধরবো।

নয়নাও সেই ভঙ্গীতে বললো—তোর মতলব বুঝতে পেরেই তো ছুট দিচ্ছি।

একটু হাত ধরাধরি করে বেড়ালে কী হয় ? এখানে কে না করছে রে ?

সবাই যা করছে, তার থেকে স্বতন্ত্র হওয়াটাই তো মৌলিকত্ব রে ! যেমন তোর বইয়ের উৎসর্গপত্র।···বইয়ের মাঝখানে লুকোনো, খাঁজে। মার্ভেলাস !

বইটাকে বুকের কাছে ভালো করে চেপে ধরলো, বললো—ইস ! এক্ষুনি সব্বাইকে দেখাতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার। তুই আবার 'রি-ইউনিয়ন' দেখালি।

আহা, তার আর কদিন দেরী ? এই তো কবে যেন, সামনের শনিবারে বোধহয়।

যত খবর দীপক ঘোষালের কাছে আসে, কে বললো তোমায় ?

এইতো সকালে রত্নার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো, বললো—রত্নাটা পাগলের মতো খাটছে—।

'রি-ইউনিয়নে' প্রাক্তন-প্রাক্তনীদের এতো কী করার আছে নয়না ভেবে পেলো না।

কিন্তু যারা খাটতে ভালোবাসে, পাগলের মতো খাটতেই চায়, তাদের আবার করবার বস্তুর অভাব ? যে-কোনো একটা কর্মক্ষেত্র পেয়ে গেলেই হলো। তবু তো বৈচিত্র্য, তবু তো উত্তেজনা উন্মাদনার স্বাদ! আর এই কর্মযজ্ঞের মাধ্যমেই হয়তো ঘটে যায় প্রিয় সান্নিধ্যলাভের সুযোগ।

এযুগে ফাংশানের এতো আধিক্যের মূল রহস্য হয়তো এইখানেই নিহিত।

তা রহস্য যেখানেই থাকুক, সত্যিই রত্না এবারে তাদের 'রি-ইউনিয়নে' দারুণ খাটছে। রত্নার ছোট বোন স্বপ্না এবছরে ইউনিভার্সিটিতে এসে ভর্তি হয়েছে বাংলায় অনার্স নিয়ে পাশ করে, সেই সূত্রে রত্নার আসা-যাওয়াটা একটু রয়েই গেছে।

এবার তাই রত্না নতুন দলের সনির্বন্ধ অনুরোধে ওদের অনুষ্ঠান পরিচালনায় কিছুটা অংশ গ্রহণ করেছে। তাছাড়া প্রাক্তন ছাত্রীদের একটা দল সংগঠন করে ফেলে তাদের দিয়ে 'প্রাক্তন-দিবসে' বিশেষ অনুষ্ঠান হিসেবে একটি গানের আসর বসাচ্ছে।

তা এরকম একটা কিছু ঘটিয়ে তোলা তো কম শ্রমসাধ্য ব্যাপার নয় ? একে তো গানের মহিলাদের রাজী করতেই হাড়ে হলুদ, তার পর তাদের গ্রুপ ঠিক করা, রিহার্সাল দেওয়ানো, ঠিক দিনে এবং ঠিক সময়ে আসবে কিনা তা নিয়ে রোজ একবার করে সত্যবদ্ধ করিয়ে নেওয়া।

তবে রত্না তো একা খাটছে না, রত্না খাটছে মানেই শান্তনুও খাটছে।

এ যেন এক অলিখিত চুক্তি।

শান্তনুর ওপর প্রধানতঃ ভার পড়েছে অবশ্য রত্না যখন যেখানে যাবে, সঙ্গে যাওয়া। অতএব শান্তনুকে জবরদস্তি করে চার চারটে দিন ছুটি নিইয়ে ছেড়েছে রত্না।

দেখেশুনে শান্তনুর কাকিমা শান্তনুর কাকার কাছে ঠোঁট উল্টে মন্তব্য করেছে—বিয়ে করা বৌও এমন বশংবদ করে রাখতে পারে না বাবা! দেখছি তো চারদিকে, নিজেকে দিয়েও দেখছি। দেখালো বটে তোমার ভাইপো। অথচ দেখো, কারুর কিছু বলবার জো নেই। আহা—সমবয়সী বোন, তার আবার একদার সহপাঠিনী, হরিহর একাত্মা হতে দোষ কী?

শান্তনুর কাকা জবাব দিয়েছিলো—বলবার জো নেই কোথায়? বলছো তো সবাই যার যা খুশী।

তার মানে স্রোত উজোন।

কাকি আর লগি ঠেলতে চেষ্টা করেনি।

তা কাকার কথাটা তো মিথ্যে নয়, অনেকেই অনেক কিছু বলে।

ওরা কিন্তু আপন আনন্দের পরিমণ্ডলে দিব্য শান্তিতে বাস করছে।

শান্তনুর ওপর আর এক কাজের ভার পড়েছে, নিজেদের সম্পূর্ণ দলটাকে যত্ন সহকারে আমন্ত্রণ করাবার। বিশেষ-অবিশেষ সব বন্ধুদের।

রত্না এক কাগজের অফিসের সহকারী বার্তা সম্পাদকের সঙ্গে জমিয়ে নিয়ে তাকে আনা ঠিক করে রেখেছে এবং তার সঙ্গে ক্যামেরাম্যানও মজুত রেখেছে।

আমাদের সক্কলের একটা গ্রুপ ফটো তুলিয়ে প্রত্যেককে একটা করে কপি প্রেজেন্ট করবো আমি—ঘোষণা করেছিলো রত্না।

শান্তনু যদিও এ বাসনাকে পাগলের বাসনা বলেছিলো এবং

যেটা স্বাভাবিক সেটাই বলেছিলো। অর্থাৎ যার যার ইচ্ছে হবে দাম দিয়ে নেবে।

কিন্তু রত্না তার গোঁ বজায় রেখেছে।

বলেছে—না উপহার। আমি আর কবে কী সূত্রে বন্ধুদের জন্যে একটু খরচ করবো বল ?

শান্তনু উত্তর দিয়েছিলো—কেন, একধার থেকে তো বিয়ের উপহার দিয়ে চলেছিস। আরো দিয়ে চলবি, ইতিমধ্যেই তো আবার ফার্স্ট গ্রুপেদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি শুরু হয়ে গেছে—

রত্নার মতে সে আলাদা, সেটা লৌকিকতা। নেমন্তন্ন যখন উপলক্ষ-কেন্দ্রিক হয়, তখনই উপহারটা লৌকিকতা হয়ে দাঁড়ায়, শুধু ভালোবেসে কিছু দেওয়া অন্য জিনিস। অতএব এই গ্রুপ ফটোয় সক্কলের চেহারা থাকা চাই।

শান্তনু তাই আমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে হাতে লেখা একটা করে চিঠিও পাঠিয়েছে সবাইকে। আর যারা কাছে আছে, তাদের বাড়ি গিয়ে এবং টেলিফোনে রত্নার ওই সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছে।

আবেদনটি ব্যর্থ হয়নি, যদিও সবাই একবার করে রত্না আর শান্তনুকে নিয়ে হেসেছে। ছেলেরা বেচারী শান্তনুর অবস্থা ভেবে আক্ষেপ করেছে।

আবার নিশ্চয় আসবে ঠিক করেছে।

দীপক আর নয়না ঠিক করেছিলো, এক সঙ্গে আসবে না, আলাদা আলাদা আসবে, সেটাই শোভন।

কিন্তু এমনি মজা, আলাদা এসেও যখন ঢুকলো, দেখলো দুজনে প্রায় এক সঙ্গেই এসে গেছে। দুজনে বিস্ময়ের চোখে তাকালো, আহ্লাদের হাসি হাসলো।

তবে সেটা অপরের চোখে পড়লো না, কারণ তখন নতুন পুরনো সবাই আসছে দলে দলে। সেই দলে মিশে গেলো ওরা।

দীপক তার সঙ্গে বেশ বড়ো গোছার এক গোছা 'হে ঈশ্বর, তোমার

যবনিকা'—এনেছে বটে তবু ভাবেনি, সত্যিই এমন সবাইকে এক-সঙ্গে পাবে। ভাবেনি বাসবী আসবে রৌরকেল্লা থেকে, জয়তী বরাকর থেকে, জয়দীপ দুর্গাপুর থেকে এবং সমীরটা একেবারে বম্বে থেকে।

সত্যি ভাবা যায়নি। কিন্তু কোন্ লগ্নে কার কোন্ বার্তাটি যে হৃদয়ের দরজায় গিয়ে কলিং বেল টেপে।

পরস্পরের দেখা মাত্রই একটা করে উল্লাসের ঢেউ উঠেছে, একটু থিতিয়ে যাচ্ছে, আবার নতুন ঢেউ এসে ধাক্কা মারছে। এই প্রথম দর্শনের কলরোল সমুদ্র কল্লোলের কাছাকাছি।

মেয়েদের কণ্ঠধ্বনিই প্রবল।

শঙ্খধ্বনির মতো আকাশে উঠছে।

প্রধানা প্রশ্নকর্ত্রী হচ্ছে রত্না; কিন্তু প্রায় সকলেই একসঙ্গে কথা বলছে। কার প্রশ্নের উত্তর কে দিচ্ছে, কার কথায় কে সায় দিচ্ছে, অথবা কে প্রতিবাদ করছে, কে হেসে গড়াচ্ছে, কে হাসি থামিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছে, বোঝবার উপায় নেই, শুধু উল্লসিত ধ্বনির সমারোহ—এই বাসবী, তোর বাচ্চাটিকে আনলি না কেন?··· নেহাৎ বাচ্চা? তা তার বাবাটাকেও নিয়ে এলে পারতিস? গেটের বাইরে কোলে করে···হি হি, দাঁড়িয়ে থাকতো।···হি হি হি, কার কাছে রেখে এলি? মার কাছে? মানে তোর মা? তবে আর কি? কলকাতায় এনেছিস? মায়ের কাছে জমা রেখে আহ্লাদ করতে বেরিয়েছিস! বাচ্চার মার পক্ষে আইডিয়াল অবস্থা!···কী রে নবীনা, চোগা চাপকান এঁটে শ্যামলা মাথায় দিয়ে এলি না কেন?···খুব সেকেলের মতো কথা বললাম?···ওসব আজকাল উঠে গেছে? উঠলেই হলো? সিনেমায় রোজ দেখছি না? একটা করে কোর্টের দৃশ্য তো সব ছবিতেই থাকবে।···যাক, উঠে তুই আবার চালু কর। বেশ 'বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র' দেখতে লাগবে। এখনো পাশ করে বেরোসইনি?···তাতে কী, আমরা একবার দেখে চোখ জুড়োতাম। এ দিন কি এ জীবনে আর আসবে?···পাশ করা না করার কথা

তুলছিস যে? করবি তো নিশ্চয়? কী হতে চলেছিস রে? উকিল, না অ্যাণ্টর্নী? উকিল? জিতারও। ভবিষ্যতে ডিভোর্সের কেস নিয়ে তোর কাছে গিয়ে পড়বো।...এই জয়তী, কী হচ্ছে কী? এখনো বিয়েই করলি না, আর ডিভোর্সের কেস ঠুকছিস? হি হি হি, শুধু তাই নয় রে, পাকা ঘুঘুর মতো তার মধ্যে আবার উকিলের ফি বাঁচানোর ব্যবস্থাও করে রাখছে এখন থেকে। আরে আরে, এটা কে? ইলা! সিঁথিতে সিঁদুর মানে বিয়ে করে বসে আছিস? আর আমাদের বলিসনি? ছি ছি। না হয় বাবা খেতে-টেতে দিতিস না, তোর বর দেখে চক্ষু সার্থক করে এক বোতল কোকাকোলা গিলে চলে আসতাম।...তা বরটাকে কেন আনলিনি? দেখতাম। ...বর আমাদের দেখা? আহা সে যা দেখেছি সে তো তার বর্বর মূর্তিতে। একটা মেয়ের পিছনে হ্যাংলার মতো ঘুরে মরছে। এখন আত্মস্থ মূর্তিতে দেখতাম।...বাবা সুলেখা, তুই যে কলকাতাই আছিস বোঝাই যায় না। কফি হাউসে কতোজনের সঙ্গে দেখা হয়, তোর সঙ্গে যদি একদিনও। সময় পাস না? আহা, এতো কী কাজ বাবা! টিউশ্যানি করছিস দু-তিনটে? কেন? এতো অর্থ পিপাসু হলি কবে থেকে?...বাবা মারা গেছেন? দাদা বৌ নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে? তোর ওপরই সব? ই—স্। কিছু মনে করিস না ভাই, জানতাম না তো। দাদাগুলো এমন স্বার্থপর হয় কেন বল্ তো? সুভদ্রার দাদাটাও তো—বিয়ে করলেই ছেলেগুলো বাজেমার্কা হয়ে যায়।...এই উমা, খবরদার। আমার দিকে আঙুল তুলবি না।...আচ্ছা ভাই, যাবো একদিন তোদের বাড়ি, মাসিমার সঙ্গে দেখা করে আসবো।...এই শান্তনুটা কোথায় তা আমায় জিজ্ঞেস করছিল কেন রে? কে জানে কোথায় ঘুরছে।...জয়দীপ, তুই হঠাৎ দুর্গাপুরে চলে গেলি যে কাউকে না বলে-কয়ে? কী রকম লাগছে? ভালো নয়? কেন?...ওখানেও তো পলিটিকস?... ওখানেই তো বেশী হবে রে, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল টাউন।...

...যাক, নয়না এসেছিস তাহলে? শান্তনু বললো তোর সঙ্গে

দেখা হয়নি। কার্ডটা বাড়িতে দিয়ে এসেছে। দীপকটাকেও ধরে এনেছিস তো? বাঁচলাম!···কী? তুই ধরে আনিসনি?···ও নিজেই এসেছে? আরে কান টানলেই মাথা আসে। আ-হা-হা জানতে কারো বাকি আছে যেন। তা কবে হচ্ছে শুভ কাজটি? দেখিস বাবা খবরটা যেন পাই। ইলার মতো ফাঁকি দিসনি। আহা কতোদিন যে বিয়ে বাড়ি···হি হি, ছ্যাঁচড়া খাইনি। হি হি হি। ···নয়না, কী মার্ভেলাস শাড়িটা পরেছিস রে? উঃ, কটা মাথা খোয়াবি কে জানে!···কি বললি? শাড়িটা মোটেই দামীটামী নয়, সুতী, বম্বে প্রিণ্ট? তোর কথা শুনে সেই কথাটা মনে পড়ে গেলো, সাবান মাখিনি তবু···হি হি হি।···সমীর, তুমি যে বম্বে থেকে আসতে পারবে ভাবতে পারিনি, বোঝা যাচ্ছে আমাদের ওপর এখনো টান আছে। বৌ কেমন সংসার করছে?···চলে যাবো একদিন বম্বের একখানা টিকিট কেটে, তোমার বৌয়ের হাতের রান্না খেয়ে আসবো—রান্নায় আনাড়ি? আহা, আগে থেকেই বাধা দিচ্ছো? যাচ্ছি না বাবা, যাচ্ছি না, খামোকা ভদ্রমহিলার নিন্দাবাদ করতে হবে না।

কথার ফুলঝুরি।

কথার তুবড়ি।

কথার ঐকতান বাদন।

প্রথম উচ্ছ্বাস থিতোলে এক-একজন এক-একজনের সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে। এই দেখেছিস ইলাটা কী সাজটা সেজে এসেছে? বাব্বা না হয় একখানা বিয়েই করেছিস। তাই বলে কনে সেজে কলেজে আসবি?···জয়ন্তীটা কী মোটাই মুটিয়েছে দেখেছিস? চওড়া পাড়ের শাড়ি পরে যেন পাটের গাঁটের মতো দেখতে লাগছে।

···ওই মেয়েটা কে রে? দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না তো?···পালি শিখতো? কি জানি। একখানা রুমাল কেটে ব্লাউজ বানিয়েছে বোধহয়। হি হি হি।···এই রুমা আসেনি না? না আসাই স্বাভাবিক। শুনেছিস তো রুমার কথা? শীগগিরই

বোধহয় ডিভোর্স করবে।···উঃ, কী প্রেমের কী পরিণতি! মনে আছে তো রোজ ক্লাশ কামাই করে করে···আমার কিন্তু তখনই মনে হতো অমন একটা ফক্কর চেহারার লোকের সঙ্গে কি বেশীদিন টিঁকবে?···চেহারায় কিছু যায় আসে না?···আসে বাবা, যায় আসে। ওরকম রাফ চেহারার লোক প্রকৃতিতেও অমার্জিত হয়।··· গীতাটা তো আমেরিকায় চলে গেছে জানিস বোধহয়? জানতিস না? লাক। লাকের জোরে বিরাট একখানা বর বাগিয়ে ফেলেছে। অথচ নো লাভ। হি হি হি, যা বলেছিস, লাভের ব্যবসা না ফেঁদেই পুরোপুরি লাভ! সে ভদ্রলোক বাইশ দিনের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলো, তার মধ্যে কনে খুঁজে বিয়ে করে ফিরে যাবে। অতএব বাছাই করবার আর টাইম পেলো না।···না তা বলছি না, গীতা অবশ্য দেখতে খারাপ নয়, তবে এরকম একটা যোগাযোগ না ঘটলে কি আর ওরকম জামাই জোটাতে পারতেন ওর বাবা?

হ্যাঁ। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই এতো সব কথা হয়ে যাচ্ছে। জানা হয়ে যাচ্ছে এতোজনের ইতিহাস। হচ্ছে সমালোচনা, প্রকাশ হচ্ছে মর্মবেদনা।

পুরুষেরা এরকম নয়।

পুরুষেরা সহজে উদ্বেলিত হয় না। শোকে-দুঃখে নয়, আহ্লাদে-উল্লাসে নয়। ওরা যে পরস্পরের ঘাড়ে রদ্দা মেরে অথবা পিঠে ঘুসি মেরে কথা বলছে না তা নয়, তবু তার মধ্যে মাত্রা আছে। এক নিশ্বাসে সব কথা উজাড় করবার তাল নেই।

ওরা হয়তো বলছে, কী রে, ফিলিপসের কাজটা ছেড়ে দিয়েছিস শুনলাম? আছিস কোথায় এখন? স্টেট ব্যাঙ্কে ঢুকেছিস? ওঃ তাহলে তো কথাই নেই। ভবিষ্যত সোনা দিয়ে বাঁধানো হয়ে গেছে। ···আরে বাস। কতোদিন পরে দেখা। করছিস কি এখন? বিয়ে করেছিস? বলিস কি, ইতিমধ্যেই এতো উন্নতি? একেবারে পিতৃদেব হয়ে বসে আছিস? কবে হলো এতো? তারপর বল্ বৌ কেমন হয়েছে, ছেলে কেমন হলো—

তোর বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো একদিন, দুঃখ করে বললেন তুই নাকি আর বাড়িতে থাকিস না, কী ব্যাপার বল দিকিনি? ওঃ, সেই ঘটনা? পৃথিবীর আদি ও অকৃত্রিম ব্যাপার? মহিলা! বৌয়ের সাথে মায়ের বনল না, অথচ বাসার অভাবে তোকে বৌয়ের জামাইবাবুর বাড়িতে থাকতে হচ্ছে এখনো? তোর অবস্থাটা তো তাহলে বিশেষ সুখের বলে মনে হচ্ছে না। ওই তো রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় আর উলুখড়ের প্রাণ যায়। আমরা বিবাহিত পুরুষেরা হচ্ছি উলুখড়।···এরপর দেখিস বৌয়ের ওই নিজের দিদির সঙ্গেও বনবে না, বেধে যাবে নারদের বাজনা।···তা যাক— কাজকর্ম কী হচ্ছে? কোথায় আছিস এখন?

কোথায় আছিস?

অর্থাৎ কোন্ অফিসে কোন্ ফার্মে কোন্ কোম্পানীতে— এককথায় কোন্ কর্মক্ষেত্রে। ছেলেরা কখনো ওই কর্মক্ষেত্র সংক্রান্ত কথাটাই বাদ দিয়ে কথা বলে না। ওইটাই তো আসল। ওইটাই মূল জীবন।

মোটামুটি উচ্ছ্বাসটা কমলো, কোকাকোলার বোতল হাতে এসে যাওয়ায়। রসনা দ্বারা দুটো কাজ একসঙ্গে হয় না।

যখন খাবারের প্লেট এলো তখন হঠাৎ কে যেন বলে উঠলো— প্রায় সবাই এসেছে, শুধু প্রবীরটাই—

প্রবীর!

প্রবীরের কথা আর তুলো না।

ওর আর পদার্থ নেই, ও স্রেফ গোল্লায় গেছে।···হেন বন্ধুবান্ধব নেই, যার কাছে না ধার করেছে, আর—দেখা হয়ে গেলে লজ্জিত হওয়া তো দূরের কথা, উল্টে যেন তেড়ে মারতে আসে। এই তো সেদিন আমার সঙ্গেই হঠাৎ বেগবাগানের মোড়ে দেখা—একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ইংরিজিতে খুব বোলচাল মারছে। আমি গাড়িটা থামিয়ে বললাম—এই প্রবীর, রোদে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি করছিস? আয়, উঠে আয়।

খিঁচিয়ে উঠে বললো—কেন? রাস্তায় দাঁড়িয়ে ধার শোধের তাগাদা দিতে লজ্জা করছে? তাই গাড়িতে তুলে কজা করে তাগাদা মারবি?

দেখে দুঃখ হলো, মনে হলো বোধহয় ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া হয় না। যদিও ওর চেহারা দেখে 'বন্ধু' বলে পরিচয় দিতেও অস্বস্তি হচ্ছিলো। তবু বললাম—তুই আবার আমার কাছে ধার নিলি কবে? তাই তাগাদা? উদোর বোঝা বুঁদোর ঘাড়ে চাপাচ্ছিস? আয়, আয়। কোয়ালিটিতে চলে গিয়ে একটু আইসক্রীম খাওয়া যাক।...তা করলে কি জানো? প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বললো—শালা বড়োলোক, মহানুভবতা দেখাতে এসেছিস। মহানুভবতায় আমি ইয়ে করি। টাকা ধার নিয়েছি, টাকা শোধ দেবো ব্যস। কড়ায় গণ্ডায় শোধ দেবো। গাড়ি দেখিয়ে ফুটানি মারতে আসিসনি।

শান্তনু বললো—মাথাটা গেছে—

কিন্তু কী হলো বল্ তো?

আরে বাবা, সেই যে ওর কাকার বাসার পাড়ায়—মা-বাপ তো নেই, কবে গেছেন ওর মনেও পড়ে না, কাকার বাসাতেই থাকতো। সেই কাকার বাসার পাড়ায় পুতুল বলে একটা মেয়ে ছিলো, বাল্যকালাবধি—যা হয় আর কি। প্রতাপ শৈবলিনী, পার্বতী দেবদাস, রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত!...কিন্তু মেয়েটা নাকি বিয়ে করলো। ও বেচারী জানে ওরই জিনিস, বাক্সে তোলা আছে, ঠিক সময় বার করবে, আর মেয়েটা কিনা হঠাৎ একটা পাঞ্জাবী ছোকরার সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেলো।

পাঞ্জাবী ছোকরা!

তাইতো শুনেছি—শান্তনু বলে, তাও কি শিক্ষিত-টিক্ষিত, স্রেফ একটা ফেরিওলা ছোকরা। অবশ্য চেহারায় একেবারে রাজপুত্তুর। সাজসজ্জায়ও খুব, প্রায়ই ওপাড়ায় আসতো ফল্‌স মুক্তোর মালাটালা, কাঁচের হীরের গয়নাফয়না বেচতে। রত্নারাও কিনেছে টিনেছে তার

কাছে। বলে যে, কানের ওই তুলটুল না কি, দেখলে জড়োয়া বলে ভ্রম হয়। তা প্রবীরের পুতুলেরও বোধহয় ওই ফল্‌স মুক্তোর মালাকে আসল বলে ভ্রম হলো। বিশ্বাসঘাতকতা বড়ো ভয়ানক জিনিস! বিবাহিতা স্ত্রী বিশ্বাসভঙ্গ করলে যেমন হতো, ওর প্রায় তেমনই হলো। কোথা থেকে একখানা ছুরি জোগাড় করে ফেলে কেবল শাসিয়ে বেড়াতে লাগলো—আসুক শালা এ পাড়ায়—কিন্তু আর আসে সে? অথচ ওর চৈতন্য নেই, ওর বিশ্বাস ও যখন অফিসে যায় তখন আসে, সেই সন্দেহে অফিস যাওয়া বন্ধ করলো। সময়ে নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করলো। ওই নিয়ে বাড়িতে বচসা, হতভাগা মেয়ে জাতটার ওপরই এমন ক্ষেপে গেছে যে কাকিমা, দিদি, বৌদি সবাইকে যা-তা বলে বসে, খিঁচিয়ে কথা বলে। কাকা বললো—পথ দেখো। ঢের করেছি তোমার জন্যে, উচিত শিক্ষা হয়েছে আমার! একটা লক্ষ্মীছাড়া তুচ্ছ মেয়ের জন্য যার এতো অধঃপতন, সে আবার মানুষ! জগতে আর মেয়ে নেই? ভালো বিয়ে দিয়ে দিতে পারি না তোর? তা যখন করবি না, দূর হ।

শান্তনুর কথার সঙ্গে সঙ্গে জয়দীপ বলে ওঠে—তা কাকা কিছু অন্যায় বলেনি, একটা বাজে মেয়ের জন্যে প্রবীরের মতন অমন একটা ব্রিলিয়ান্ট ব্রাইট ছেলে—

এই সময় নয়না কথা বললো।

এতোক্ষণ নয়না দুঃখের মুখ নিয়ে শুনছিলো প্রবীরের কথা, ওর চোখের কোণায় সেই দুঃখের ছায়া। নয়নার গলার স্বরটাও বিষণ্ণ বিষণ্ণ, বললো—ভুল করছো জয়দীপ, তুচ্ছ একটা মেয়ের জন্যে নয়, ওর গভীর একটা বিশ্বাসের ওপর প্রচণ্ড একটা ঘা পড়েছে। সেই আঘাতে ও পৃথিবীর ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে।

হতে পারে—

বললো কেউ কেউ।

দীপক বললো—যদিও শুনতে ঠিক স্টেজের নাটকের মতো নাটকীয় প্রণয় ভঙ্গ, নাটকীয় প্রতিহিংসা, তবে জীবনের মধ্যেই তো

সব নাটক ঘটে। এই থেকেই হয় তো নাটকের নায়কের মতোই পাগল হয়ে রাস্তার রাস্তায় ঘুরতে পারে। প্রবীর রাস্তায় কলের জল খেয়ে দিন কাটাতে পারে।

নয়না ভারী আহত হয়

নয়নার হঠাৎ দীপককে খুব হৃদয়হীন বলে মনে হয়। অথচ এখানে উপস্থিত কেউই যে প্রবীর সম্পর্কে খুব একটা হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছে, তা নয়। কেই-বা সহানুভূতি দেখিয়েছে? সকলেই বলেছে প্রবীরটা উচ্ছন্নে গেছে, প্রবীরটা শেষ হয়ে গেছে, প্রবীরটার বারোটা বেজে গেছে—

নয়নার মতো কেউ করুণাঘন দুটি চোখ তুলে ক্ষুব্ধ ব্যথিত গলায় বলেনি—প্রবীরকে নিয়ে ঠাট্টা কোরো না, দুর্ভাগ্য ওকে এইভাবে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে, কিন্তু মনে রেখো একদিন ও আমাদের বন্ধু ছিলো। আর মনে রেখো ও কী রকম ছিলো।

পরিস্থিতিটা পানসে হয়ে গেলো, একটু দমে গেলো প্রায় সকলেই, কেউ কেউ-বা অস্ফুটে বললো—তা সত্যি।

কেউ কেউ-বা আরো অস্ফুটে বললো—নিজেকে নিজে নষ্ট করলে, কে কী করবে?

আর মেয়েরা অনেকেই মনে মনে বা বিশেষ নেপথ্যে বললো—চং! করুণাময়ী! ওই নোংরাটার জন্যে আবার মায়া!

লোকটা যে যারপর নাই নোংরা হয়ে গেছে তা তো অনেকেই জানে, অনেকের মুখে অনেকে। ও যে কোথায় কোথায় থাকে, কখন কী খায়, ভগবান জানেন, হঠাৎ দেখা যায় হয়তো ময়লা প্যান্টের ওপর একটা ভালো জামা চাপিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে, মুখে একমুখ দাড়ি, মাথায় একগাদা চুল, মুখটা ঘৃণায় বিকৃত।

সহজে কেউ দেখা দেয় না, কারণ এখন সবাই জেনে নিয়েছে, কারুর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেলেই বলবে—পকেটে কী আছে ছাড় দিকিনি, কিছুদিন থেকে বেজায় টাইট যাচ্ছে!

কেউ কোনো উপদেশ বা সৎ পরামর্শ দিতে এলে বলে—জ্ঞান দিতে আসিসনি। বেশী বাড়াবাড়ি করলে থাপ্পড় খাবি। পয়সা-কড়ি না থাকে ছুটো সিগারেট দিয়ে যা।

হঠাৎ হঠাৎ কারুর বাড়িতে ও এসে যায়। বিশেষ করে শান্তনুদের বাড়ি।

শান্তনুর নামে একটা ঘর আছে বাড়িতে, সেটা একতলায়। সেটাই ওর বসবার ঘর, শোবার ঘর, লেখাপড়া করার ঘর, বন্ধুজন এলে আড্ডা দেবার ঘর। আগে ছাত্রাবস্থায় কতো আড্ডা বসেছে এ ঘরে। এখন প্রবীর এসেই একেবারে শান্তনুর বিছানার ওপর সটান শুয়ে পড়ে বলে—এই শান্তনু, আমি এখন যতোক্ষণ ইচ্ছে ঘুমুবো, ডিসটার্ব করবি না। আর তোর ওই পেয়ারের বোনটা যেন এসে বকবক না করে। ওকে দেখলে মাথা জ্বলে যায়।

মেয়ে জাতটার ওপর দারুণ বিতৃষ্ণা বলেই হয়তো প্রবীর নিজেকে ধ্বংস করবার সবচেয়ে বড়ো বোঝাটা ফেলেনি নিজের ওপর।

শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

শান্তনুর মা বিরক্ত হয়ে উঁকিঝুঁকি মারেন, আর বলেন—সেই প্রবীর? ও না লেখাপড়ায় খুব ভালো ছিলো বলতিস? তার এই অবস্থা? শুয়ে আছে। ঘরে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে! ছিঃ! ওই চাদর-বালিশ পাল্টে তবে শুবি তুই।

অতএব বলা যায় নয়না ব্যতিক্রম।

নয়নার মতো করুণাময়ী কেউ নয়।

খাবারের প্লেট খালি হবার পর আবার আবহাওয়া একটু হালকা হলো, এইবার গানের আসর বসবে। গানের আসরের জন্যে সকলেই যে খুব উৎসাহী তা নয়, তবে রত্না বলেছে একটু পরেই ফটোগ্রাফার আসবে, সে পর্যন্ত অন্তত থাকো বাবা সবাই।

ফটো সম্পর্কে অবশ্য সকলেই মুখে ঔদাসীন্য দেখালেও মনে মনে উৎসাহী। ও একটা ভারী মজার জিনিস। যাঁদের এবেলা-ওবেলা

ফটো ওঠে, এমন সব দেশবরেণ্যরাও ক্যামেরা তাক্ করা দেখলেই একটু অবহিত হন, নড়েচড়ে বসেন। দেশের প্রধানমন্ত্রীও ক্যামেরা দেখলে মুখে একটু অলৌকিক স্মিত হাসির প্রলেপ মাখান।

অতএব, ফটো? এই চেহারায় আবার ফটো তুলে কী হবে? আমাকে বাদ দাও বাবা, আমার বদলে বরং আমাদের দ্বারোয়ান দুখন সিংকে বসিয়ে দাও। ধরতে পারবে না কেউ (বলা বাহুল্য বুড়ো দ্বারোয়ান দুখন সিং রূপের জন্য বিখ্যাত),...ইস, আগে জানলে আচ্ছা করে সেজে আসতুম...এ-মা, আমার এই লাইট ব্লু শাড়িটার তো কোন রং-ই উঠবে না। বলবি তো আগে?...ইত্যাদি ইতেশ্চেতঃ ঘোষণা সত্ত্বেও রয়েও গেলো সকলেই।

ক্যামেরাম্যান এলো, আর ঠিক সেই সময়ই হঠাৎ সকলের মধ্যে একটা গুঞ্জন ধ্বনি উঠলো।

অভাবিত অপ্রত্যাশিত এক ঘটনা।

হঠাৎ মঞ্চে সেই বহু বিতর্কিত নায়কের আবির্ভাব।

এইরে প্রবীর!...প্রবীর এসেছে। ওকে কার্ড দেওয়া গিয়েছিল?...চেহারাটা কী হয়েছে রে? কী পরে এসেছে রাস্তার মস্তানদের মতো?

অস্ফুট গুঞ্জন ধ্বনির ভিতরের ভাষা অনেকটা এই।

অবশ্য এই প্রাক্তনদের দলেও, যারা সকলেই প্রায় কিছু না কিছু বিশিষ্ট কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত এবং যাদের মধ্যে অধ্যাপকও আছে তাদেরও মস্তান মার্কা পোশাকের অভাব নেই। চকরাবকরা ছাপ, নামাবলী ছাপ এসব আছে তাদের বুশ শার্টে কিন্তু প্যাণ্টগুলো তো সভ্য?

প্রবীরের পরনে একটা বিচিত্র ছাপ বুশ শার্ট আর বহু বিচিত্র ছাপে জর্জরিত এক ঢোলা পায়জামা।...তবে দাড়িটা কামানো মসৃণ করে এবং বহুদিন না ছাঁটা চুলও কিছুটা বিন্যস্ত। অর্থাৎ সেজেগুজে এসেছে প্রবীর।

প্রবীরের বাঁ হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, ডান হাতে চোখ থেকে খুলে

নেওয়া চশমাটা গাড়িবানেরা যে কায়দায় গাড়ির চাবি নাচায় প্রবীর সেই কায়দায় চশমাটা নাচাতে নাচাতে বলে ওঠে—এই বাইরে ট্যাকসিটা দাঁড়িয়ে আছে, ভাড়াটা মিটিয়ে দিয়ে আয় তো কেউ। অনেকক্ষণ থেকে ঘুরছি, কতো উঠেছে দেখিনি। দেখে দিস।

প্রবীরের অকস্মাৎ আবির্ভাবে কেউ কেউ যে খুশী হয়নি তা নয়, কতকটা কৌতূহলে, কতকটা-বা এই অস্বস্তিতে, যতোটা যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে, বোধহয় ততোটা নয়, কথার ভঙ্গীটা অনেকটা আগের মতোই আছে।

কায়দা করে কথা বলাই তো স্বভাব ছিলো ওর। তবে ড্রিঙ্ক করে এসেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে।

তা ওতে আজকাল আর নিন্দে নেই, দোষ বলে ধরে না কেউ।

অতএব ভালোই লাগছিলো। কিন্তু ওই ট্যাকসির ভাড়া মিটিয়ে দেওয়ার অর্ডারে মন বেজার হয়ে উঠলো। এ তো ভালো বিপদ।

নাম করে ডেকে বলেনি কাউকে কাজেই দায়িত্বটা ঠিক কারুরই নয়, আবার ওই একই কারণে দায়িত্বটা সকলেরই।

ইতস্তত: করে যখন ছেলেরা প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়েছে, আর মেয়েরা সবাইকে দেখিয়ে ধীরে সুস্থে ব্যাগের মুখ খুলছে, তখন নয়না চট করে উঠে গেল, এবং একটু পরেই ব্যাগের মুখ বন্ধ করতে করতে ফিরে এলো।

রত্না এখন বললো—তুই তাড়াতাড়ি দিতে গেলি কেন? আমিই যাচ্ছিলাম—।

নয়না বললো—ঠিক আছে।

রত্না গলা নামিয়ে বললো—কতো উঠেছিলো রে?

নয়না আরো নীচু গলায় বললো—ও কিছু না।

এখন সকলে নিশ্চিন্ত চিত্তে হৈ-চৈ করে উঠতে পারছে—যাক প্রবীর খুব সময়ে এসে পড়েছিস। এক্ষুনি ফটোটা তোলা হয়ে যেতো। আমরা ভাবছিলাম তুই হয়তো আর এলিই না, ভুলে মেরে দিয়েছিস।

যেন এতোক্ষণ প্রবীরের সম্পর্কে কোনো বিরূপ মন্তব্যের ছন্দাংশও ছিলো না এখানে, যেন সকলেই হা প্রবীর জো প্রবীর করছিল।

প্রবীর কিন্তু এই সস্নেহ হৃদয়গুলির দিকে তাকিয়েও দেখলো না। সে-ঠোঁটটা ঘৃণা আর ব্যঙ্গে ঝুলিয়ে বলে উঠলো—এই গরীব হতভাগা ভিখিরি প্রবীরের সঙ্গে ফটো তোলবার জন্যে কে কে মরে যাচ্ছিল? তুমি? তুমি? তুমি?

হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা প্রায় ছ্যাঁকা দেবার ভঙ্গীতে প্রত্যেকের মুখের কাছে এগিয়ে এনে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে হেসে বলে চলে প্রবীর—তুমি? তুমি? তুমি? নাঃ কেউ নয়। একমাত্র ওই ন্যাকামার্কা মহিলারা হতে পারেন। মেয়েরা সং দেখতে ভালোবাসে, বাঁদর পুষতে ভালোবাসে, কীরে শান্তনু, তোর ওই পেয়ারের বোনটা এখনো কারুর সঙ্গে কেটে পড়েনি, জোটাতে পারেনি কোন শিশিবোতলওয়ালা, কোনো ছাতা সারানওলা? কোনো জুতো সারাইওলা? পারেনি কাউকে জোটাতে?

নয়না আস্তে দীপককে বলে—এই দীপক, ওকে ওভাবে কথা বলতে বারণ করো না—।

দীপক চাপা বিরক্তির গলায় বলে—বারণ করলে শুনবে? মদে তো চুর হয়ে আছে।

মাতালরা ধমকে ভয় পায়।

দীপক বলে—তোমার ইচ্ছে হয় দাও ধমক। দেখি তোমার থিয়োরিটা কতখানি কার্যকরী।

প্রবীর তখনো বলে চলেছে—এই যে সব মহিলারা বসে আছেন, স্বর্গের পবিত্রতা মুখে মেখে, এঁদের সত্যিকার ফটো তুলতে পারিস কেউ? ওই স্বর্গীয় মোড়কের পর্দা খুলে ফেলে? হুঁ, সে ক্যামেরা-ম্যান জন্মায়নি এখনো।…ওহে ক্যামেরাম্যান, তোমার লেনসে সত্যিকার ছবি ওঠে? ফোঃ।…যা উঠবে তা হচ্ছে শাড়ির ব্লাউজের গয়নার জুতোর ছাতার চোখের কাজলের ঠোঁটের রংয়ের—।

আঃ প্রবীর! হচ্ছে কী?

নয়না এগিয়ে এসে কড়া আর দৃঢ় গলায় বলে—আমাদের সবাইয়ের মাঝখানে এসে তোমার মাতলামি করতে লজ্জা করছে না?

মুহূর্তে নিভে গেলো প্রবীর।

নয়নার মুখের দিকে স্থির চোখে একটুক্ষণ তাকিয়ে শিথিল গলায় বলে উঠলো—মাতলামি করছি আমি?

করছোই তো। এতোদিন পরে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলো সেটা বুঝে ভালোভাবে কথা কইছো?

শিথিল ভাব ত্যাগ বরে প্রবীর জোরে হেসে উঠে বললো—আরে ব্যস। শ্রীমতী কুরঙ্গীনয়না যে জ্ঞান দিতে আসছেন দেখছি! খবরদার! জ্ঞানফ্যান দিতে এসো না বলছি। ভালো হবে না, মানহানির মামলা কববো। এই যে প্রবীণা, তুমি আমার কেসটা নাও তো—।

কেউ কেউ কৌতুক বোধ করছে কারণ মাতালের মাতলামি অথবা পাগলামি সুস্থলোকের কাছে বেশ উপভোগ্য।

তবে মেয়েরা অস্বস্তি বোধ করছে।

নয়নার দুঃসাহস দেখে ভয়ও পাচ্ছে।

মাতাল আর পাগল সম্পর্কে বিশ্বাস আছে কিছু? হঠাৎ যদি গালে চড় বসিয়ে দেয় অথবা জড়িয়ে ধরে?

শান্তনু এই অস্বস্তিটা বুঝতে পেরে সেটা কাটাতে বলে উঠলো—ফটোগ্রাফার তাড়া দিচ্ছেন, সকলে ঠিকভাবে দাঁড়িয়ে পড়া হোক।

গুঞ্জন থামলো।

যে যার শাড়ির আঁচল, কপালের চুল সামলে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। ছেলেদের অবশ্য সামলাবার কিছু নেই, তাদের শুধু ভঙ্গীতে কায়দা আনা। স্মার্টের কায়দা।

প্রবীরকে প্রায় জোর করে টেনে এনে দীপকের পাশে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছিলো নয়না, মনে হলো শান্ত হয়ে দাঁড়াবে, হঠাৎ কী হলো, ছিটকে সরে এসে বললো—খবরদার! আমার ফটো তুলবে না।

ভেবেছো ভালোবাসার ভান দেখিয়ে আমায় কব্জা করবে? অতো সোজা নয়। পৃথিবীকে চিনে ফেলেছি আমি। সব জোচ্চোর, সব ধাপ্পাবাজ, সব মিথ্যুকের দল, সবাই ভেতরে ভেতরে ছুরি শানায় আর মুখে ভালোবাসার হাসি হাসে। ঘেন্না করি আমি, সব্বাইকে ঘেন্না করি।···সামনে ভালো কথা বলবে আর আড়ালে বলবে 'শালা, টাকা ধার নিয়ে শোধ দেয়নি'। কী রে ভাবছিস না তোরা? আর এই মহিলারা? দূর দূর! এদের আবার কথা! রাবিশ!

বলে গট গট করে বেরিয়ে যায় প্রবীর নামের ওই ছন্দপতনটা।

যাক বাবা, হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেলো, এরপর মন দিয়ে গান শোনা যাবে। উদ্বোধনে নিশ্চয়ই সেই বিখ্যাত গানটি গাওয়া হবে, পুরনো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়?···ও সে চোখের দেখা, প্রাণের কথা, সে কী ভোলা যায়?

আনুষ্ঠান অনুযায়ী অবধারিত গান থাকে, কিছু কিছু অনুষ্ঠানের আসরে এ গান অবধারিত।

কিন্তু গানের আগে তবলাবাদকরা যখন তবলায় হাতুড়ি ঠুকছে, তখন শ্রোতার আসরেও কিছু হাতুড়ির ঠুক ঠুক চলছে।

একেবারে অমানুষ হয়ে গেছে—।

বেশীক্ষণ যে জ্বালালো না, এই ভালো।

কার্ড দিতে গিয়েছিল কে? থাকে কোথায় ও?

ধারের ওপরই তো চালাচ্ছে, মদের পয়সা জুটছে কোথা থেকে?

কে জানে? মোট কথা, পদার্থ নেই কিচ্ছু—।

শুধুই মাতলামি, না পাগল তা ঠিক বোঝা গেলো না।

ভানও হতে পারে খানিকটা। তবে পাগলের ভান করলে ক্রমশঃ পাগলই হয়ে যায় শুনেছি।

সেই সময় নয়না দৃঢ় গলায় বললো—ভান নয়, বড়ো একটা আঘাতে সমস্ত পৃথিবীর ওপরই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে ও। হয়তো সেই অবিশ্বাসের শূন্যতায় গিয়ে আস্তে আস্তে পাগলই হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা ওর বন্ধুরা সবাই মিলে চেষ্টা করে বাঁচাতে পারি না

ওকে? আমাদের স্নেহ সহানুভূতি আর ভালোবাসা দিয়ে ওর সেই হারানো বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারি না?

রত্নাকে অনেক কটূক্তি করে গেছে লোকটা, রত্নার রাগ হয়েছে। তাই রত্নাই তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—গল্পে উপন্যাসে হয় হে নয়না, সত্যিকার মানুষের হয় না।

হয় না বলে ছেড়ে দেবো কেন আমরা, রত্না? প্রবীর তো তোরও খুব বন্ধু ছিলো। তোর আর শান্তনুর।

সে যখন মানুষ ছিলো তখন ছিল। এখন তো একটা জানোয়ার হয়ে গেছে—

ঠিক। ওর আর উদ্ধারের আশা নেই, নয়না।—দীপক বলে উঠলো—রত্না ঠিকই বলেছে, যখন মানুষ ছিলো তখনকার কথা আলাদা। জানোয়ারের সঙ্গে কি বন্ধুত্ব রাখা চলে?

নয়না দীপকের চোখে চোখ রেখে স্থির গলায় বলে—এই জানোয়ার হয়ে যাওয়া খোলশটার মধ্যে থেকে সেই মানুষটাকে ফিরিয়ে আনা যায় না, দীপক?

কে বলে উঠলো—খেয়েদেয়ে তো কাজ নেই। কার এতো সময় আছে যে—ওর কিচ্ছু হবে না বাবা।

নয়না তর্কের গলায় বলে উঠলো—আমি যদি বলি হবে। যদি বলি আমার সময় আছে।

তুমি?

কেন নয়? ছমাস সময় দাও আমায়, দেখো পারি কি না।

দীপক বিরক্ত হয়ে বললো—কী পাগলামি হচ্ছে? পাগলের হাওয়া গায়ে লাগলো না কি? কোথায় পাচ্ছো তুমি ওকে, তাই হৃদয়ের স্পর্শ দিয়ে ওর হারানো মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে আনতে বসবে?

নয়না বললো—সে ভার আমার। আমার বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে দাও। আমি বলছি—যে ভয়ঙ্কর একটা ভুলের মধ্যে রয়েছে ও সেই ভুলটা ভাঙতে হবে।

আর আমি যদি বলি—তাতে কিছুই হবে না, হয়তো শুধু নিজেকেই ভাঙ্গা হবে।

এখানে অনেক লোক, এখানে অনেক চোখ তাই নয়না তার কুরঙ্গ নয়ন তুলে বলতে পারলো না—আমার ওপর এতো কম বিশ্বাস তোমার দীপক? এতো কম আস্থা?

হাটের মাঝখানে হাটের মতোই কথা বললো নয়না। বললো—আচ্ছা বেট ফেল। সবাই বেট ফেলো। ছমাস পরে দেখো প্রবীরকে।

কেউ ফেললো না। একা নয়নাই বলে উঠল—ঠিক আছে, আমিই ধরছি। তার মানে একতরফা বাজি ধরে বসলো নয়না। একদিকে শূন্য আর একদিকে তার নিজের জীবন।

গান চলতে চলতেই হল ফাঁকা হয়ে গেলো। কে বসে বসে গান শোনে? গানের অভাব আছে না কি? অহরহই তো কানের উপর গান এসে এসে আছড়ে পড়ছে। ওর থেকে ঢের জরুরী তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা।

ফেরার সময় দুজনে একসঙ্গেই বেরোলো।

নয়না গোস্বামী আর দীপক ঘোষাল।

দীপক একটা ট্যাকসি ডাকলো, বলল—ওঠো।

নয়না বললো—তুমি কোন্ দিকে আর আমি কোন্ দিকে। ট্যাকসি ডেকে কী হলো?

হলো যা হোক। উঠবে, না রাস্তায় দাঁড়িয়ে তর্ক করবে?

নয়না নিঃশব্দে উঠে বসলো।

একটুক্ষণ গাড়ি চলার পর হয়তো উত্তাপটা ঠাণ্ডা করতেই সময় নিয়ে দীপক হতাশ গলায় বললো—তোমায় সবাই বুদ্ধিসম্পন্ন বলে জানে, হঠাৎ বোকার মতো এটা কী করলে? এ বাহাদুরীর কোনো অর্থ আছে?

নয়না গম্ভীর গলায় বললো—এটা তোমার বাহাদুরী বলে মনে হলো?

তাছাড়া আর কী? একটা অবাস্তব বিষয়কে আঁকড়ে ধরে তর্ক করে—

বিষয়টা যে অবাস্তব নয় সেটাই তোমাদের বোঝাতে চাইছি দীপক! আচ্ছা ধরে নাও ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তা তারও তো চিকিৎসা আছে?

দীপক বিদ্রূপের গলায় বলে—চিকিৎসাটা করবে কে? তুমি?

নয়না আবার আহত হয়। নয়নার আবার মনে হয়, দীপককে যেমন হৃদয়বান ভাবতাম তেমন নয়। ওর মনের মাপটা বড়ো ছোটো, ওর ভালোবাসাটা সীমাবদ্ধ।

নয়না ওর দুঃখটা লুকোতে চায় না। নয়না ক্ষুব্ধ আহত গলায় বলে—তোমার কাছ থেকে আমি এরকম কথা শুনবো আশা করিনি। একে তো ডাক্তারও দেখানো যায়।

দীপক ওর দুঃখটা অনুভব করে তবে নিজেকে অপরাধী ভেবে অনুতপ্ত হয় না মোটেই, শুধু গলাটা নরম করে বলে—নয়না, হঠাৎ একটা আইডিয়াল মানবিকতার প্রেরণায় তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি এখন আচ্ছন্ন। যদিও আমি এটাকে প্রেরণা না বলে খেয়ালই বলছি, তা যাই হোক, এখন ওই আচ্ছন্ন অবস্থায় স্পষ্ট বাস্তবকে দেখতে পাচ্ছো না। এখন কিছু বলবো না, পরে নিজেই বুঝতে পারবে। তবে এইটাই শুধু ভাবো যার থাকবার জায়গার কোনো ঠিক নেই, যে হয়তো কোনো নোংরা বস্তিতে আড্ডা গাড়তে পারে, তাকে তুমি ডাক্তার দেখাবে, ট্রিটমেন্ট করবে কোথায় বসে?

নয়না বললো—সেটাই ভাবছি। নয়নার গলাটা যেন অন্য কোনোখান থেকে এলো।

অথচ নয়না পাশেই বসে রয়েছে। শুধু ওরা অসভ্য নয় বলে স্থির শান্ত হয়ে রয়েছে। তীব্র ইচ্ছে দুরন্ত বাসনা এইসব শব্দগুলো যে ওদের মধ্যে একেবারে নেই তা নয়, অন্ততঃ দীপকের; কিন্তু নয়নার অতি বড়ো দৃঢ়।

নয়না বলে—প্রাপ্য জিনিসকে চুরি করে নেবো কেন? অধিকারের মাটিতে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নেব।

অতএব নয়না নিশ্চিন্ত হয়ে দীপকের পাশে বসে ছিলো। নামার সময় শুধু দীপকের বাহুমূলে একটা হাতের টান দিয়ে বললো—এই ট্যাকসির ভাড়াটা আমায় দিতে দেবে?

দীপক বললো—দেব। একটা সর্তে, যেখান থেকে আনা হয়েছে তোমায় আবার সেখানেই রেখে দিয়ে আসবো—।

তারপর?

তারপর, আর কি?

নয়নাকে ওর বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে দীপক সেই ট্যাকসিটাতেই আবার একা ফিরলো। আর সেই সময় দীপকের বারবার মনে হতে লাগলো, শুধু গাড়ির সিটের খানিকটা অংশই ফাঁকা হয়ে যায়নি আরো কোনোখানে যেন অনেকখানিটা ফাঁকা হয়ে গেছে অথচ ধরা যাচ্ছে না ঠিক কোন্‌খানে।

আর সেই তখনই দীপকের মনে পড়লো 'হে ঈশ্বর, তোমার যবনিকা' উপহার দেওয়া হয়নি কাউকে।

প্যাকেট বাঁধা অবস্থাতেই পড়ে ছিলো দীপকের কাছাকাছি একটা জানালার ধাপে।

গিয়েই প্রথমে নিজের বইয়ের প্যাকেট খুলে উপহার দিয়ে বসাটা নেহাৎ ছেলেমানুষী মনে হয়েছিলো দীপকের, তাই নয়নাকে আগে বলে রেখেছিলো—তুমি যেন আবার গিয়েই হৈ-চৈ কোরো না ফেরবার আগে দিলেই হবে।

নয়না তখন হেসেছিলো, বলেছিলো—ওঃ! কী কায়দা! ভাব দেখানো হবে যেন 'এই রে, ভুলে যাচ্ছিলাম'—এই তো?

কিন্তু সেই কায়দাটায়দা কিছুই হলো না। প্রবীর নামের একটা ছন্দপতনের পদপাতে সব ছন্দ এলোমেলো হয়ে গেলো।

রত্নারা শেষ পর্যন্ত থাকবে।

রত্না কি প্যাকেটটা দেখতে পেয়ে তুলে রাখবে? না কি হারিয়ে যাবে? অসম্ভব নয়। জানালার ধাপে যদি শেষ-রক্ষাকারীদের চোখে না পড়ে তা হলে পড়েই থাকবে, হয়তো কোথায় কি হয়ে যাবে।

হঠাৎ আসা একটা আকুলতা একবার দীপককে এক্ষুনি ছুটে চলে যাবার জন্যে ঠ্যালা মারলো। গেলে এখনো পাওয়া যাবে হয়তো। ট্যাকসিটাকে বলতে গেলো কিন্তু বললো না। আর ভালোও লাগলো না।

যাক গে, সে বইয়ের কপালে যা আছে তাই হোক। দীপকের প্রথম কাব্যগ্রন্থ হয়তো—

শিশিবোতলওলার ঝুলিতে চলে যাবে।

বিধুশেখর একটু চঞ্চল হচ্ছিলেন, রাতটা একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে না? দিনকাল ভালো নয়, পাড়া থেকে তো আর কেউ যায় নি, নয়না তো একাই গেছে। ফেরার সময়টাই ভাবনা, মোড়ের কোণের ওই ঝাঁকড়া গাছটার তলায় সন্ধ্যে থেকে যতো মায়ে-তাড়ানো বাপে-খেদানো ছেলে এসে বসে আড্ডা মারে, তাস খেলে।

বাস থেকে নেমে ওইখান দিয়ে তো হেঁটেই আসতে হয়।

আর একবার মনে হলো দিনকাল ভালো নয়।

পত্রলেখাও বারকয়েক জানালার ধারে ঘুরে গেছে। এবং নিজস্ব নেপথ্যে (অবশ্য বাবার কান বাঁচিয়ে নয়) মন্তব্য করেছে, এযুগে ছেলেতে-মেয়েতে তফাৎ নেই। একথা শুনতেই ভালো। তফাৎ হাড়ে হাড়ে। এই যে একটু দেরী হলেই মাথা ঘুরে যায়, এটা তো আর ছেলের বেলায় হয় না। মেয়ে মানুষের ভগবানই বাদী! স্বাধীনতা পেলেই হয় না। স্বাধীনতা ভোগ করবার উপায় কোথায় মেয়েমানুষের?

বিধুশেখর মনে মনে হেসেছেন, এটা যে বিধুশেখরকে শোনাবার জন্যেই তাতে আর সন্দেহ কী?

বিধুশেখর একবার কী বলতে গেলেন পত্রলেখা তখন আবার রান্নাঘরে।

এই সময় দরজার বাইরে গাড়ির শব্দ হলো।

বিধুশেখর কড়া নাড়া দেবার আগেই গিয়ে পড়লেন। গাড়ির

মধ্যে দীপককে দেখতে পেলেন, ওরা বিধুশেখরকে দেখতে পেলো না।

নয়না নেমে এলো গাড়ি থেকে।

কিন্তু তেমন আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে কই? যেটা নয়নার প্রকৃতি। যখনি কোনোখান থেকে ফেরে যেন আহ্লাদে ছলছলিয়ে আনন্দে ভাসতে ভাসতে।

আজ তো আরো বেশীই হবার কথা। আজ একটা বিশেষ আহ্লাদের দিন, পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলো।

অথচ আজই অন্যরকম।

বিধুশেখর মৃদু হেসে বললেন—পূর্ণিমার শশী মেঘে ঢাকা কেন?

নয়না একটু থমকে বললো—মেঘটা দেখতে পাচ্ছেন আপনি?

পাচ্ছি বৈকি।

নয়না চোখ তুলে তাকিয়ে বললো—সত্যিই বলেছেন। মেঘট হচ্ছে চিন্তার মেঘ। বলছি আপনাকে সব, আগে মাসিমণিকে বলে আসি কিছু খাবো না।

একেবারে কিছু না?

না দাদু, অনেক খাইয়েছে—

একেই দেরী তার উপর আবার রান্না খাবার ফেলা যাওয়ায় পত্রলেখা খুব শীতল গলায় বলে—রাস্তায় গুণ্ডায় ধরেছিলো বুঝি?

নয়না হেসে ফেলে বললো—দেখে তাই মনে হচ্ছে নাকি?

হচ্ছেই তো। রাত নটায় ফেরা হলো, মুখ কালো অন্ধকার গুণ্ডায় না হলে ভূতে!

এটাই ঠিক।

হেসে চলে গেলো।

কিন্তু পরক্ষণেই হাসি মিলিয়ে গেলো।

কীভাবে বলবে দাদুকে?

আবেদনটা পেশ করবে কী করে?

নিজের দিকটা ঠিকমতো বোঝাতে পারবে তো?

সঙ্কল্পটা যে নয়নার কেবলমাত্র খেয়ালই নয়, এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে মানবিকতার প্রশ্ন, মানুষ হয়ে জন্মানোর দায়িত্বের প্রশ্ন, বন্ধুকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার প্রশ্ন। সর্বোপরি একটা নষ্ট হয়ে যাওয়া মানুষকে স্নেহ সাহচর্য, সেবা সহানুভূতি দিয়ে আবার মানুষের কোঠায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব কিনা তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রশ্ন। কিভাবে আরম্ভ করবে, সেটা ভেবে ভেবে ঠিক করতে না পেরে ভাবলো, যা হবে হবে। গুছিয়ে বলতে না পারলেও দাদু বুঝতে পারবেন।

তা পারলেন অবশ্যই। যতই গুছিয়ে বলতে চেষ্টা করুক কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু বিধুশেখর তাঁর হাতেগড়া নাতনীর চিত্তবৃত্তিটা বুঝতে পারলেন।

বিরক্ত হতে পারলেন না।

দেখলেন, মেয়েটার কথাকে বিধুশেখর কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারেন না।

বিধুশেখরের নিজেরও যেন ওই পরীক্ষাটা খুব আকর্ষণীয় লাগছে। ছেলেটা নাকি পাগল হতে বসেছে—

নয়না বললো—চোখের সামনে যদি দেখি একটা লোক পিছ্‌লে পড়ে জলে ডুবে যাচ্ছে, তলিয়ে গেলো বলে তাকে উদ্ধার করতে হাত বাড়িয়ে দেবো না দাদু?

বিধুশেখর গম্ভীর গলায় বলেন—দিতেই হবে! কিন্তু নিজে না তলিয়ে যাও সেটাও দেখা দরকার। ব্যাপারটা যে রীতিমতো রিসকি তা তো মানতেই হবে?

নয়না মাথা নীচু করে বলে—শক্ত কাজেই যে আনন্দ দাদু!

পারবে বলে বিশ্বাস রাখছো নিজের উপর?

নয়না একটু হেসে বিশ্বস্ত সরল দুটি চোখ তুলে বললো—কেন পারবো না? আপনি তো সঙ্গে রইলেন?

অনেক রাত্রে কথাটা মনে পড়লো নয়নার।

নয়না বিছানায় উঠে বসলো।

মনে হলো এক্ষুনি উড়ে চলে গিয়ে হল-এর জানালার ধাপে রাখা দীপকের 'হে ঈশ্বর, তোমার যবনিকা'র প্যাকেটটা তুলে নিয়ে আসে। ···এখন নয়না কী করবে?

আশ্চর্য! কী করে এমন হলো?

দীপক ভুলে যেতে পারে, নয়না ভুলে গেলো কী করে?

গতকালকের সমস্ত আনন্দ আয়োজনের মধ্যে নয়নার কাছে তো ওইটাই ছিলো প্রধান।

দীপকের উপরও রাগ হলো। ওই-বা মনে করলো না কেন? নিয়ে যখন গিয়েছিলি একরাশ বই, বন্ধুদের দিবি বলে মনে থাকবে না সেটা?

নয়নার কেমন মনে হলো, দীপকের এই ভুলটা ইচ্ছাকৃত। দীপক নয়নার আগ্রহের ওজনটা মাপতে চেয়েছিলো।

ভেবেই আবার লজ্জা করলো।

দীপককে এরকম কূটবুদ্ধির নায়ক ভাবলো নয়না?

আচ্ছা, বইগুলো কি রত্নারা দেখতে পেয়েছিলো? পাওয়াই তো উচিত। দেখেই বুঝতে পারবে। বাড়ি নিয়ে গিয়ে রেখে দেবে।

অতএব রত্নাই ভরসা। অথবা শান্তনু।

প্রথমে শান্তনুর বাড়ি যাওয়াই ঠিক করলো। রত্নাদের বাড়িতে অনেক লোক; আর রত্নার মার চোখ বড় অনুসন্ধিৎসু। রত্নাদের বাড়িতে কড়া নেড়ে দরজা খোলাতে হয়, যেমন নয়নাদের বাড়িতেও হয়।

শান্তনুর ঘরের দরজা অবারিত।

সেই অবারিত দরজার মধ্যে পা দিতেই দেখতে পেলো চৌকিতে বসে দীপক আর শান্তনু চা খাচ্ছে। দীপককে দেখে তো আহ্লাদই হবার কথা, অথচ নয়নার যেন রাগ হলো, অভিমান উথলে উঠলো। নয়নার মনে হলো কাল রাত থেকে নয়না যে মনঃকষ্ট পাচ্ছে তার জন্যে দীপকই দায়ী।

ইচ্ছে করেই নয়নাকে কষ্ট দিয়েছে দীপক।

নয়না যেন দীপককে দেখতেই পেলো না, বলে উঠলো—শান্তনু, ত্না কি আসবে এখানে ?

যেন এখন এই মুহূর্তে রত্নাই নয়নার কাছে সবচেয়ে জরুরী।

শান্তনু হেসে বললো—রত্না এই একটু আগেই এসেছিলো, ালটা রেখে গেছে।

নয়না চোখের পাশ দিয়ে দেখলো চৌকির একধারে সেই ্যাকেটটা। কিন্তু নয়না আপাততঃ কিছু দেখতে পাবে না তাই াকাশ থেকে পড়ে বললো—মাল মানে ?

আরে বাবা, যার জন্যে সকালবেলাই দুজনে দুদিক থেকে ছুটে সেছো।

নয়না তেমনি নির্লিপ্ত গলায় বললো—কই আমি তো কোনো কিছুর জন্যে ছুটে আসিনি, রত্নার সঙ্গে একটু দরকার ছিলো, তাই—

নয়নার এই অভিমানের অর্থ বুঝতে দেরী হয় না দীপকের। হু হেসে বলে—এটা কিন্তু রত্নাদের বাড়ি নয়—

নয়না ওর দিকে একবার আলগা চোখে তাকিয়ে নিয়ে বলে -অনেক সময় থাকেও—

শান্তনু হেসে বলে—সে সব আর বেশী পাবে না, এখন ব্যাপার ন্য। ওই তো বইটা দিয়েই পালালো। না হলে আমার মাতুলানী াগে বাতুলানী হয়ে উঠবেন।

নয়না শান্তনুর মুখের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বললো—কেন ?

শান্তনু মাথা নেড়ে বললো—নো কারণ।

কিন্তু সে যাক, দীপকটা বইগুলো নিয়ে এসে আমাদের দিলো না কী বলে ? এতো ভুল ?

ভুল নয়—দীপক অবহেলার মতো করে বলে—শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখলাম ওই বাজে বইটা ধরে ধরে সবাইকে গছানোর কোনো মানে হয় না।

নয়না কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো, বললো না। শান্তনুর দিকে

তাকিয়ে বললো—রত্নার সঙ্গে দরকার ছিলো, আচ্ছা তুমিও বোধহয় বলতে পারো, তুমিই তো কার্ডফার্ড দিয়ে বেড়িয়েছো, প্রবীরের ঠিকানাটা কী ?

দীপক চৌকি থেকে উঠে আসে, গম্ভীরভাবে বলে—প্রবীরের য ঠিকানা, সেখানে মেয়েদের যাওয়া সম্ভব নয় ! সেটা নরক !

নয়না দীপকের এই অসহযোগী মনোভাবের জন্যে আবা কালকের মতোই ক্ষুব্ধ হয়ে ভাবে, দীপককে যা ভাবি তা নয় দীপকের হৃদয় বড়ো সঙ্কীর্ণ।

নয়না টেবিলের ধারটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার চুলগুলে ভিজে আর খোলা, সকালবেলা চান করা অভ্যাস নয়নার।

নয়না সেই খোলা ভিজে চুলের ডগা আঙ্গুলে জড়াতে জড়াতে বলে—পাপীকে নরক থেকে উদ্ধার করে আনবার জন্যে দেবদূতদের একবার নরক দর্শন করতে হতে পারে।

শান্তনু বলে ওঠে—তুই যতো বলছিস ততো তা বলে নয় দীপক যদিও আমি বলছি না যে সে খুব একটা ভালো জায়গায় আছে তবে নরক-ফরক বললে কেমন লাগে।···আসলে আছে একটা চায়ে দোকানে—

চায়ের দোকানে !

তাইতো দেখে এলাম—বললো দীপক।

নয়না ভাবলো বোকার মতো মান দেখানোর কোনো মানে হ না। নয়না খুব সহজ ভঙ্গীতে বলে উঠলো—আরে তুমি দে এসেছো ? তবে আর শান্তনুকে কষ্ট দিই কেন ? চলো চলো, দাদুকে বলে ঠিক করে ফেলেছি আমাদের ওখানেই থাকবে এখন—

দীপক অবাক হয়ে গেলো। এরকম একট অবাস্তব প্রস্তাব যে কর সম্ভব তার তা ধারণা ছিলো না।

দীপকের মনে হলো রাগ করে নয়নাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে চুপ করে বসে থাকা যায় না।

দীপক দৃঢ় গলায় বললো—ওকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে গি

রাখবে? এমন একটা অ্যাবসার্ড কথা তোমার মাথায় এলো কী করে?

নয়না উদাস গলায় বললো—আর কোনো উপায় দেখতে পেলাম না বলে—

দেখতে পেলে না, হবে না। তুচ্ছ একটা জেদের জন্যে যা-তা কিছু করার কোনো মানে হয়?

নয়না দাঁড়িয়ে ছিলো, কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না, তাই নয়না চৌকিতে বসে পড়ে বলে—তোমার বক্তব্যে কিছু ভুল আছে দীপক। প্রথমত একটা জেদ নয়—সংকল্প। তাছাড়া কোনো অসুস্থ বন্ধুকে নিজের বাড়িতে নিয়ে চিকিৎসা করানোর ইচ্ছাটা কি সত্যিই খুব অ্যাবসার্ড? সংসারে এমন ঘটনা ঘটে না?

অসুস্থ!

দীপক কথাটা একটু সশব্দে উচ্চারণ করে তারপর বলে—মাতলামীটা যদি অসুস্থতা হয় তাহলে অবশ্য তোমার বন্ধুকে অসুস্থ বলতে হয়।

শুধু আমার বন্ধু নয়, আমাদের বন্ধু!—শক্ত গলায় বলে নয়না—তুমি যে হঠাৎ এমন মায়া-মমতাশূন্য সহানুভূতিহীন হয়ে উঠলে কেন তুমিই জানো। পাগলামী রেখে চলো দিকি। শান্তনু, তুমিও না হয় চলো। ওকে ওই বিশ্রী জায়গা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতেই হবে—

তারপর আস্তে বলে—ওর তো জিনিসপত্র বলতেও কিছু নেই। এখনই নিয়ে যাওয়া যায়।

দীপক বললো—নিয়ে যাবো বললেই ও যাবে এই তোমার বিশ্বাস?

নয়না একটু হেসে বললো—বলার মতো করে বলতে পারলে যাবে এই বিশ্বাস।

শান্তনুর জানা ছিলো তাই, নইলে নয়না কি দীপকের সাধ্য ছিলো কালীঘাট অঞ্চলের একটা অপরিসর গলির মধ্যে অপরিচ্ছন্ন এই চায়ের দোকানটাকে খুঁজে বার করা ?

চালাঘরের মতো দোকান, উঁচু দাওয়ায় ধোঁয়া ওঠা একটা উনুন জ্বলছে, আর দোকানেরই উপযুক্ত একটা লোক একটা তালপাতার পাখা নিয়ে সেটাকে ঠ্যাঙ্গাচ্ছে। লোকটার পরনে ধুতির ওপর গামছা গায়ে, গেঞ্জির বালাই নেই। কালো মোষের মতো চেহারা।

ট্যাকসিটাকে ছাড়তে হয়েছে কারণ এই সরু গলিতে সে ঢুকতে রাজী নয়নি।

পায়ে হেঁটেই গলিটা পার হতে হলো।

শান্তনু এগিয়ে গিয়ে সেই চাওয়ালাকে বলে—আচ্ছা, প্রবীরবাবু এখনো আছে এখানে ?

লোকটা শান্তনুকে নিরীক্ষণ করে দেখে নিয়ে বলে—আপনি সেদিন এসেছিলেন না ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ তাহলে তো তোমার মনেই রয়েছে। বাঃ!

শান্তনু এমন উৎসাহের ভাব দেখায় যে মনে হতে পারে ওই আধবুড়ো চাওয়ালাটার স্মৃতিশক্তির বহরে ও মুগ্ধ।

সেই উৎসাহের গলাতেই বললো—তা তাকে একবার ডেকে দিতে হবে যে ভাই!

তেনার এখন অর্ধেক রাত্তির।—খুব নির্বিকার ভঙ্গী লোকটার।

শান্তনু নেপথ্যে বলে—সেরেছে! মুখে বলে—তা হোক, একটু ডেকে দাও। বলোগে তার বন্ধুরা এসেছে।

চাওয়ালা মনে মনে কী বলে কে জানে, মুখে বলে—ডেকে আমি দিতে পারি, ওঠা না ওঠা তেনার মর্জি। আপনারা যদি ওনার বন্ধু তো নিয়ে যান না বাবু ওনাকে। এসব জায়গায় কি আপনাদের বন্ধুকে মানায় ?

তারপর ডাক দেয়—এই হারু, ওই পাগলাবাবুকে ডেকে দে তো। বলবি—আপনার বন্ধুরা ডাকছে—

বলে বটে হারুকে, কিন্তু নজর ফেলে রাখে নয়নার ওপর।

নয়নার দৃষ্টি এড়ায় না সেটা। খুব অস্বস্তি বোধ করে সে। যেন এক মিনিটের মধ্যে কাজটা মিটিয়ে ফেলে পালাতে পারলে হয়।

হারু বোধহয় চাওয়ালার 'বয়'।

হারুর পরনে একটা সুতো ঝোলা হ্যাফ প্যাণ্ট, গায়ে একটা শতছিদ্র গেঞ্জি, হাতে বৃহৎ একটা অ্যালুমিনিয়ামের কেটলী যার সর্বাঙ্গে কালির পুরু প্রলেপ।

হারু বেজার গলায় বলে ওঠে—ডাকলে উঠবে ?

তুই ডাকবি কিনা ?

হারু গজগজ করতে করতে দোকানের পাশ দিয়ে কোথায় যেন চলে গেলো।

তারপর অপেক্ষা।

সময়টা যেন অনন্তকাল।

চাওয়ালা বলে—এক বাটি করে চা হোক বাবু ? দুরকম আছে, দশ পয়সা আর ষোলো পয়সা।

বলা বাহুল্য কেউই রাজী হয় না। অথচ দাঁড়িয়ে থাকাও বিরক্তিকর।

সামনেই রাস্তার কল, তাকে কেন্দ্র করে একটা নারকীয় দৃশ্য, এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে থাকা কী মারাত্মক

অথচ হারুর টিকি দেখা যাচ্ছে না।

এর থেকে বুঝি চা খেয়ে খানিকটা সময় কাটালেই ভালো হতো। দীপক বললো—নয়না, তুমি কি আরো থাকতে চাও ?

নয়না অসহায় চোখে তাকিয়ে বলে—ছেলেটা এসে কী বলে দেখো।

অতএব আরো অপেক্ষা।

অনেকক্ষণ পরে দেখা গেলো সেই নোংরা ছেলেটার ঘাড়ে হাতের ভর দিয়ে কোন্‌খান থেকে যেন বেরিয়ে আসছে প্রবীর।

বোঝা যাচ্ছে এখনো খোঁয়াড়ি ভাঙেনি ঘুমের অথবা নেশার।

এদের তিনজনকে দেখে বোধহয় একটু থমকে গেলো, সচকিত হলো, তবে বিস্ময় প্রকাশ করলো না, ব্যস্তও হলো না। ব্যঙ্গের গলায় বলে উঠলো—এই পবিত্র ভোরবেলায় তোমাদের মতো দেব-দেবীর এই নরকে অগমন কেন বাবা?

ছেলেরা কিছু বলার আগে নয়না এগিয়ে এসে দৃঢ় গলায় বলে —আমরা তোমায় এখান থেকে নিয়ে যেতে এসেছি।

আমায় নিয়ে যেতে এসেছো?

প্রবীর হা হা করে হেসে ওঠে। হাসি যেন থামতেই চায় না।

কী হচ্ছে কী?

শান্তনু ধমকে উঠলো—আমাদের সময় কম, তাড়াতাড়ি চলো দিকি? জিনিসপত্র আছে কিছু? আচ্ছা থাক, সে আর নেওয়ার দরকার নেই।

প্রবীর এবার শিথিলতা ত্যাগ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, কড়া গলায় বলে উঠলো—হঠাৎ তোমাদের সঙ্গে তাড়াতাড়ি যেতে হবে কেন শুনতে পাই না? কোথায় যেতে হবে? কোন্ স্বর্গভূমে?

দীপক অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সিগারেট খাচ্ছে। শান্তনুর মুখে অস্বস্তির ছাপ—

নয়না বোঝে দীপক এ ব্যাপারে কোনো ভূমিকা নেবে না।

ঠিক আছে, না নিক।

নয়না প্রবীরের খুব কাছাকাছি সরে এসে বললো—তোমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবো।

প্রবীরের পরনে একটা নীল লুঙ্গি, গায়ে একটা ঝোলা কোট, কোটের সব বোতামগুলোই খোলা। তার মধ্যে থেকে লোমে ভরা বুকটা দেখা যাচ্ছে আর সেইটুকু থেকেই বোঝা যাচ্ছে বুকের হাড়গুলো প্রকট হয়ে উঠেছে।

কী স্বাস্থ্য ছিলো প্রবীরের!

কালো রঙেও একটা দীপ্তি ছিলো।

এখন দীপ্তিটা নেই, শুধু কালোটাই চোখে পড়ছে।

নয়না মৃদু গলায় বললো—চেহারাটা কী হয়ে গেছে দেখছো শান্তনু ?

শান্তনুকেই বললো, কারণ দীপক তো অন্যদিকে ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্রবীর নয়নার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে নয়নার পা থেকে মাথা অবধি দৃষ্টি বুলোচ্ছিলো। সে দৃষ্টিতে লালসা নেই, আছে ব্যঙ্গ —তিক্ত ব্যঙ্গ।

নয়না আবার বললো—যেমন আছো তেমনি চলো। আমরা এখনই তোমায় নিয়ে যাবো ঠিক করে এসেছি।

প্রবীর ছাড়া ছাড়া ভাবে বললো—তোমাদের বাড়ি ? শুভ কাজটি তা হলে সারা হয়ে গেছে ? কবে হলো বাবা ? গরীবকে একটা ভোজ থেকে বঞ্চিত করে ?'

নয়না দীপকের দিকে তাকালো, দীপক তেমনি নির্বিকার। নয়না প্রবীরের চোখের দিকে তাকালো, তেমনি বিদ্রূপ মাখা, তবু নয়না নরম গলায় বললো—তুমি একটা ভুল করছো প্রবীর, আমাদের বাড়ি মানে আমার দাদুর বাড়ি, যেখানে বরাবর আছি—

তোমার দাদুর বাড়ি ? সেখানে আমায় যেতে হবে ?

প্রবীর তার শিথিল ভঙ্গী ত্যাগ করে বলে—মানেটা কী বলতো ?

মানে খুব সোজা প্রবীর, তুমি অসুস্থ, তোমার চিকিৎসার দরকার, এভাবে থাকলে তুমি—

নয়নার কথা অবশ্য শেষ হতে পায় না, প্রবীর আবার হা হা করে হাসতে থাকে সিনেমার খল নায়কের ভঙ্গীতে টেনে টেনে অনেকক্ষণ ধরে। তারপর বলে—চিকিৎসার দরকার ? খুব ঠিক। কিন্তু ম্যাডাম, সেটা কার ?···ওহে শান্তনু, তোমরা দু-দুটো প্রেমিক থাকতে এই মহিলার মাথার চিকিৎসা হচ্ছে না ?

শান্তনু জানে কখন ধমক দিলে কাজ হয়, সেটা দেয় শান্তনু। কড়া গলায় বলে—যা তা কথা বলবি না। তুই তো কাকার বাড়ি

থেকে চলে এসেছিস, এইভাবে আছিস, তোর শরীর যথেষ্ট খারাপ হয়ে গেছে। আমরা চাই তুই আবার আগের মতো সুস্থ হয়ে উঠবি।...

তোমরা চাও? প্রবীর নাক কুঁচকে বলে—তোমরা চাও তাতে আমার কি কাঁচকলা? তোমাদের চাওয়ায় পৃথিবী চলবে? আমার শরীর খারাপ হোক, আমি জাহান্নামে যাই, তাতে তোদের কী রে?

নয়না স্থির গলায় বলে—আমাদের কিছু আছেই নিশ্চয়, না হলে স্বেচ্ছায় এই জাহান্নামে আসবো কেন? তোমায় আমি আমার দাদুর কাছে নিয়ে যাবো। তোমায় ভালো হতে হবে, তোমায় আবার আগের মতো হতে হবে।

কিন্তু প্রবীর এতে গলে না, প্রবীর চেঁচিয়ে বলে ওঠে—করুণা দেখাতে এসেছো? মহিমা ছড়াতে এসেছো? মহিমময়ী করুণাময়ী বেশী ঘাঁটিও না আমায়, কেটে পড়ো, কেটে পড়ো। কেন বাবা, বেশ তো দীপকের সঙ্গে মিলে-জুলে ছিলে, আর বুঝি পটছে না? হবেই তো। শালা মেয়েমানুষের স্বভাব—

নয়না, আমি যাচ্ছি। তুমি যাবে, না এখনো থাকবে?

হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দীপক আগুন ঝরা গলায় বলে—তোমার যদি আরো থাকতে ইচ্ছে হয় থাকো, আমি পারছি না। উঃ, অসহ্য।

দীপক গট গট করে এগিয়ে যায়।

নয়না শান্ত গলায় বলে—আচ্ছা তোমার যদি কাজ থাকে, চলে যাও। শান্তনু তো রইলো—

দীপকের আগে প্রবীরই চেঁচিয়ে ওঠে—না, খবরদার! তুমি থাকবে না। চলে যাও, চলে যাও এখান থেকে। আমার খুশী আমি এই নরকে থাকবো। আমার খুশী আমি মদ খাবো, আমি নোংরা বস্তিতে থাকবো, পাঁউরুটি খেয়ে কাটাবো, তোমাদের সহানুভূতির থলিটি নিয়ে কেটে পড়ো মাণিক।

তোমায় না নিয়ে তো যাবো না প্রবীর।

ফের ? ফের ক্যাঁচক্যাঁচানি ? গেট আউট, গেট আউট। মনে করেছো ওই বাহারে চোখের ঘায়ে যেমন দু-দুটো হতভাগাকে ঘায়েল করে রেখেছো, তেমনি আর একটাকেও—বৃথা আশা দিদিমণি! কিস্যু হবে না।···শান্তনু, এটাকে ধরে নিয়ে চলে যা, অসহ্য লাগছে। মেয়েমানুষের মোহিনী শক্তি বিস্তার করতে এসেছে। ঘেন্না নেই ? লজ্জা নেই ?

নয়না তাকিয়ে দেখলো। ক্রুদ্ধ দীপক চলে যাচ্ছে।

ওর দিকে তাকিয়ে নয়নার মুখে একটু বিচিত্র হাসি ফুটে উঠলো।

কিন্তু নয়না চেঁচিয়ে বললো—এই দীপক, বড়ো রাস্তায় গিয়ে তুমি ততোক্ষণ একটা ট্যাকসি ধরো, আমরা আসছি।

নয়না তারপর শান্তনুকে বললো—এই শান্তনু, ওই চাওলাটাকে জিগ্যেস করতো, প্রবীরের কাছ থেকে ওর কোনো পাওনা-টাওনা আছে কিনা।

বললো খুব নীচু গলায় তবু আশ্চর্য, বুঝে ফেললো প্রবীর।

প্রবীর খ্যাঁক করে বলে উঠলো—জিগ্যেস করে কী হবে ? তোমরা ধার মিটিয়ে মাল ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে ?···বলুক দিকি ও, পাওনা আছে। আমার মার গলার হারটা ওকে দিয়ে রাখিনি ? মা যেটা আমার বৌয়ের নাম করে রেখে গিয়েছিলো ? বলুক ও, ততো টাকার খেয়েছি আমি ওর ?

নয়না ব্যথিত গলায় বলে—শান্তনু, এর পরেও আমরা ওকে এখানে ফেলে রেখে যাবো ?

দীপক চলে যাওয়ার পর শান্তনুও অসহিষ্ণু হচ্ছিলো। শান্তনু এখন বললো, ও না গেলে কী করবার আছে ? বেঁধে নিয়ে যাওয়া তো সম্ভব নয় ?

নয়না মৃদু হাসি হেসে বলে—তাও সম্ভব। কিন্তু বোধহয় এখন হচ্ছে না।

প্রবীরের দিকে ফিরে বলে—প্রবীর, তোমাকে নিয়ে যাবোই

যাবো এই প্রতিজ্ঞা আর বিশ্বাস নিয়ে এসেছিলাম, হেরে ফিরে যেতে বলছো?

প্রবীর চোখ দুটো কুঁচকে তাচ্ছিল্যের গলায় বলে—আমার বলার কী আছে ম্যাডাম? আপনি কি আমার সঙ্গে পরামর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন? না বুঝেসুঝে অমন যা তা প্রতিজ্ঞা করে বসতে নেই, বুঝলেন? যান যান, নিজের চরকায় তেল দিনগে···ওহে শান্তনু, মহিলাকে নিয়ে যাও শীগগির, দেখছো না ওর লাভার গোঁসা করে চলে গেলো। যাবেই তো, মেয়েছেলেকে বিশ্বাস আছে? এক্ষুনি হয়তো এই হেরোটার সঙ্গে প্রেম করে ফেলে ভেগে পড়বে।

শান্তনু ভেবেছিলো দীপক হয়তো চলেই গেছে। কিন্তু বড় রাস্তায় এসে দেখলো একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে দীপক।

ওদের দিকে তাকালো দীপক।

নয়না একটু পিছিয়ে আছে। ওর পিছনে কেউ আছে কিনা লক্ষ্য করলো দীপক, দেখলো কেউ নেই, মেজাজটা ফিরে এলো, হাল্কা হলো।

সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে বললো—কী হলো? প্রতিজ্ঞা রক্ষা হলো না?

শান্তনু ইসারায় জানালো উত্তর দিতে গেলে নয়না শুনতে পাবে; তাই গলা তুলে বললো—দে, একটা সিগারেট দে। এমন হুড়িয়ে নিয়ে এলো নয়না।

নয়না এসে গম্ভীর চালে বললো—কই, ট্যাকসি ধরোনি?

এ গাম্ভীর্যটা যে অসাফল্যের অপ্রতিভতা ঢাকতে, তা বুঝতে পারল দীপক, তাই আর কিছু বললো না। মেয়েরা যে কখন কিসে ক্ষেপে যায়, কখন কিসে উদ্বেলিত হয়।

দীপক বললো—একটা সিগারেট খেয়ে নিচ্ছিলাম।

শান্তনু একটা বোকামী করে বসলো। শান্তনু বললো—তা তুমি

তো একাই যাবে, হতভাগাটা তো এলো না, আর ট্যাকসি লাগবে ? তুমি তো ষোলো নম্বরেও চলে যেতে পারো ?

বোকামীর ফল ফললো, নয়না আত্মস্থ গলায় বললো—এলো না বলে তো ছেড়ে দেবো না। নিয়ে ওকে যেতেই হবে। এখানে থাকলে আর কটা দিন বাঁচবে ও ?

শান্তনু ভাবলো, পৃথিবীতে প্রতিটি মিনিটে কতো লোক মরছে, কতো লোক জন্মাচ্ছে।

আর দীপক ভাবলো, পৃথিবীতে কতো মানুষ মরছে তাতে কার কী এসে যাচ্ছে ?

অথচ বলতে পারলো না কেউ কিছু।

কারণ ওই বলাগুলো হতো অ-মানবিকতা।

কিন্তু একথা কি নয়নাকে বলা যায় ?

নয়নাকে যা বলা যায় তাই বললো দীপক—কী হবে ? ষোলো নম্বরেই যাবে, না ট্যাকসি ধরবো ?

নয়না বললো—যা ইচ্ছে করো, আমার কিছু ভালো লাগছে না। প্রবীরটার অবস্থা ভাবো—

দীপক ট্যাকসি ডাকে।

আরো একবার ভাবলো দীপক, প্রবীর নামের বুদ্ধিভ্রংশ ছেলেটা যদি না-ই বাঁচে, পৃথিবীর কতোটা লোকসান ? কতোটা লোকসান কুরঙ্গী নয়নার ?

ভেবেই যেন পা থেকে মাথা অবধি একটা বিদ্যুতের শক খেলো।

দীপক হঠাৎ এতো নীচ আর ছোট হয়ে গেল কী করে ?

নয়নার কথাটা মনে পড়লো, শুধু একা আমার বন্ধু নয় দীপক, আমাদের সকলের বন্ধু।

ট্যাকসির আগে ষোলো নম্বর বাস এসে গেলো। নয়না চলে গেলো ষোলো নম্বরে।

শান্তনু আর দীপককে নিজ নিজ প্রার্থিত নম্বরের বাসের জন্যে আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হলো।

এই সময় দীপক একবার বলে বসলো—শান্তনু, রত্না তো তোর নিজের বোন নয় ?

শান্তনু সচকিত হয়ে ওঠে, তার কান দুটো হঠাৎ জ্বালা করে।

শান্তনু তবু স্বাভাবিকত্বটা বজায় রাখতে চেষ্টা করে, বলে—কে বলেছে নিজের বোন ?

তা হলে ওকে বিয়ে করতে দোষ কী ?

শান্তনু বললো—কী যে বলিস।

এভাবে থাকার কোনো মানে হয় না। তোদের তার মানে কোনো দিনই সংসার-টংসার হবে না ?

নাই-বা হলো। তোরা তো সবাই রয়েছিস।

আমরা কে কার কী করছি ?

শান্তনু হেসে উঠে বলে—আর করলেই-বা কে অ্যালাউ করবে ? এই তো নয়না একটু পরোপকার করতে চাইছে, আমরা কি সেটা বিশেষ সমর্থন করছি ?

দীপক গম্ভীর হয়ে যায়।

ওর কেস আলাদা। ওর রিসার্চটা শেষ হয়নি।

শান্তনু বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে—তুই তাহলে ওই রিসার্চটার জন্যেই ক্রুদ্ধ ?

দীপক আস্তে বলে—ছাখ শান্তনু, যতোই আমরা সভ্যতার উৎকর্ষের বড়াই করি, মানুষ এখনো আদিম যুগ থেকে এক ইঞ্চিও সরে আসেনি। সেকালে যে বলা হতো ঘী আর আগুন সেটা কিছু ভুল বলা হতো না, এই আমার বিশ্বাস। এখনো সেই একই প্রবাদ সমান বলবৎ।

তুই তাহলে নয়নাকে এখনো ভালো করে চিনিসনি দীপক। শান্তনু বলে—রত্নার মতে ওর মতো মেয়ে সর্বদা দেখতে পাওয়া যায় না।

দীপক একটু হাসলো।—রত্না তো বলবেই, স্বজাতি যে।...তবে

কথাটা মিথ্যে বলেনি। সর্বদা যে সব মেয়েদের দেখতে পাওয়া যায় তারা হঠাৎ এমন অসম্ভব বায়না করে বসে না। আমি তো ভাবতেই পারছি না কোন্ সাহসে নয়না প্রবীরটাকে বাড়িতে টেনে নিয়ে যেতে চায়। কেউ কখনো শুনেছে এরকম ?

শান্তনু কী বলতে যাচ্ছিলো, বাস এসে পড়লো ওর।

'আচ্ছা' বলে হাত নেড়ে চলে গেল।

দীপক দাঁড়িয়ে রইলো আরো কিছুক্ষণ। আর তখন ভাবতে লাগলো, নয়নার ওপর রাগ করে লাভ নেই। ওরও এটা পাগলামী ছাড়া কিছু নয়। শুনতে পাওয়া যায় সাময়িক পাগলামী নামের একটা ব্যাধি আছে।

খবরটা সাংঘাতিক বৈকি !

রত্না চোখ কপালে তুলে বললো—বলিস কি শান্তনু, সত্যি প্রবীরটাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলেছে নয়না ?

শান্তনু বললো—তাই তো জেনে এলাম ! অবিশ্বাস্য !

হ্যাঁ, ওই অবিশ্বাস্য ঘটনাটা জেনে এসেছে শান্তনু। তারপর শান্তনুর কাছে রত্না, রত্নার কাছে বাসবী, বাসবীর কাছে শুভেন্দু, শুভেন্দুর কাছে নবীনা, নবীনার কাছে ইলা, ইলার কাছে জয়ন্তী, এবং আরো অনেকে।

প্রায় তড়িৎ গতিতেই এই জানাজানিটা। হয় প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, নয় টেলিফোনযোগে, নয় পত্রযোগে। ওরা জানলো নয়নাটা সেই যে সেদিন তর্কের সময় ঝোঁকের মাথায় অহঙ্কার করে বলেছিলো, একজন অধঃপতিত মানুষকে স্নেহ সহানুভূতি দিয়ে উদ্ধার করা সম্ভব, এবং প্রবীরকে আবার মানুষ করে তোলবার সাহস ও রাখে। সেই অহঙ্কারের প্রতিজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠিত করতে নয়না প্রবীরকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলছে !···নিজের বাড়ি আর কি, সেই ওর দাদুর বাড়ি। যেখানে থাকে। কী কৌশলে যে সেই সনাতনী পণ্ডিত দাদুটিকে ও হাত করলো ভগবান জানেন। দাদুই না কি নিজে

নয়নাকে সঙ্গে করে গিয়ে প্রবীরের সেই বস্তির বাড়ি থেকে ওকে নিয়ে এসেছেন।

জগতে কী যে সম্ভব, আর কী যে সম্ভব নয়। প্রবীর নাকি ওই বুড়োকে দেখেই কেমন থতমত খেয়ে সুড়সুড় করে ওঁর পিছু পিছু গাড়িতে উঠে এসেছে।···কী চাল্লু মেয়ে বাবা, বুড়ো ভদ্রলোককে এমন অনাসৃষ্টি কাণ্ডয় রাজী করালো কী করে?

সংবাদ সরবরাহের পর তোড় বইলো মন্তব্যের এবং হুল্লোড় বইলো হাসির।

তা হলে দাদু-নাতনীতে মিলে এবার একটা 'মানসিক চিকিৎসাগার' খুলুন!···আরে না না 'পতিতোদ্ধারিণী আশ্রম' হি হি হি! দেখালো বটে একখানা আমাদের কুরঙ্গী নয়না!···ছাখ্ এখন দীপক ঘোষালের কপালে কী আছে। না, দীপক তেমন ক্যাবল ছেলে নয় যে, প্রেয়সীকে পতিতোদ্ধারকল্পে ছেড়ে দেবে। লেগে যাবে নারদ নারদ!···না-রে আমার ভয় হচ্ছে দীপকটা না রেগে গিয়ে কাট্ আপ করে।···

পাগল! সে খুব শক্ত ছেলে। তাছাড়া—নয়নাটা এক বগগ হোক আর যাই হোক, অনেস্ট!···তা যাই বলো, নাটক কোন্ দিকে গড়ায় কে জানে!···কিন্তু এরকম একটা বেহেড্ মাতাল লোককে সেই দাদু যে কী করে—?

হ্যাঁ, এই প্রশ্নটাই সব থেকে বেশী আলোড়ন তুলেছে। যেখানে নয়নার মতো একটা সুন্দরী যুবতী কুমারী মেয়ে অধিষ্ঠিত, সেখানে একটা সম্পূর্ণ অজানা অচেনা নিঃসম্পর্কীয় যুবক ছেলেকে আশ্রয় দিলেন কী করে? তাই কি একটা সৎ ভদ্র ছেলে? উচ্ছন্ন যাওয়া মাতাল ছেলে!

রত্না কোম্পানীর এই প্রশ্নটা সরাসরি এসে করলো মহাশ্বেতাও ঠিক ওই ভাষাতেই আরো একটু যোগ করে—আপনার বিবেচনার ওপর আমার অবশ্য কথা কওয়া উচিত নয় বাবা, কিন্তু আমি যে

ভেবে পাচ্ছি না, কী বলে আপনি ওই একটা কে না কে অজানা অচেনা মাতাল দাঁতাল ছেলেকে বাড়ির মধ্যে এনে ঢোকালেন।

এই জোর অভিযোগের উত্তরে কিন্তু বিধুশেখর রেগে না গিয়ে হেসে উঠে বললেন—মহাতো আজকাল অনেক কথা শিখেছিস। ওহে কুরঙ্গী নয়না, বাংলা শব্দকোষটা একবার আনো তো দেখি, 'দাঁতাল' শব্দটার অর্থ কী।

মহাশ্বেতা রাগ করে চলে গেলো।

বাইরের দিকের ঘরটায় প্রবীরকে রাখা হয়েছে। এবং প্রবীর রয়েওছে। এটা একটা আশ্চর্য বৈ কি! আসাটা আশ্চর্য, থাকাটা আশ্চর্য। আর আরো আশ্চর্য, বিধুশেখরের সামনাসামনি হলেই সে যেন একেবারে শান্ত নম্র ভদ্র এক শিক্ষার্থী।

বিধুশেখর বলেছেন—যতোই তোমরা ইংরেজি বিদ্যায় পারদর্শী হও, সংস্কৃতের চর্চাটা করা দরকার। এই সংস্কৃত ভাষা যে কী অমূল্য রত্নভাণ্ডার! তুমি যতো ডুব দেবে, ততোই অবাক হয়ে যাবে। দেখবে সেখানে কত রত্ন।

সেই শুনে প্রবীর হঠাৎ বলে বসেছে—আমি শিখবো। আপনি শেখান।

তদবধি পঠন এবং পাঠন চলছে জোর কদমে। প্রবীরের উত্তাল বিকৃত চিত্তবৃত্তি হঠাৎ এতোদিন পরে আবার যেন নিজের হারানো জগতের সন্ধান পেয়ে স্থির হতে চাইছে। আর হয়তো বিধুশেখরও এক ইচ্ছুক শিক্ষার্থীকে হাতে পাবার আনন্দের স্বাদে বহির্জগতের কুটিল প্রশ্নের দিকে তাকিয়ে দেখতে ভুলে যাচ্ছেন।

মহাশ্বেতার অভিযোগ তাই তাঁর কাছে কৌতুককর মনে হলো। যেন এই ছেলেটাকে তাঁর তরুণী নাতনী একটা এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের বস্তু হিসেবে নিয়ে আসেনি, যেন ছেলেটা নিজেই গুরুগৃহে বাস করে শিক্ষালাভ করতে এসেছে।

কিন্তু সেটাই কি সব সত্যি?

নয়নাকে না দেখতে পেলেই তবে অস্থির হয়ে ওঠে কেন ছেলেটা? কেন তখন আবার তার মধ্যে অপ্রকৃতিস্থতা দেখা দেয়?

পত্রলেখা বলে—ছাখ্ নয়না, তোর আর কোথাও বেরোনো-টেরোনো চলবে না। তুই না থাকলেই তোর প্রবীর এমন অস্থিরতা করে, দেখে ভয় লাগে।

নয়না শঙ্কিত হয়, বলে—কী আবার করে?

বললে কিছুই নয়, দেখলে অস্বস্তি। খাবার সময় হলেও খেতে চাইবে না, বলবে নয়না আসুক। মিনিটে মিনিটে জিজ্ঞেস করবে, 'নয়না কোথায় গেছে? নয়না কখন আসবে? নয়নাকে আপনারা রাস্তায় একা ছাড়েন কেন?' কাজকর্ম মাথায় ওঠে আমার। এই দেখে এলাম চৌকিতে লম্বা হয়ে শুয়ে মন দিয়ে একখানা বই পড়ছে, ওমা, তক্ষুনি হঠাৎ রান্নাঘরের দরজায় এসে বলে উঠলো, 'আচ্ছা আপনাদের এখানে ফেরিওয়ালা আসে? মুক্তোর মালা বেচতে? হীরের আংটি বেচতে?'···এরকম আবোলতাবোল কথা শুনে ভয় করে না? অথচ নয়না কাছাকাছি থাকলে প্রবীর নামের ছেলেটা বলতে গেলে শান্তই।

বুদ্ধির ঘরেও শূন্যতা ধরা পড়ে না।

মহাশ্বেতা রাগ করে চলে যাবার পর নয়না এসে দেখলো প্রবীর বিষণ্ণ মুখে চৌকিতে বসে আছে পা ঝুলিয়ে।

নয়না ঘরে ঢুকতেই বলে উঠলো—উনি তোমার মা না?

নয়না বললো—হ্যাঁ। ভেবেছিলাম তোমার সংগে চেনা করিয়ে দেবো, তা চলেই গেলেন মহিলা, বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে।

প্রবীর বললো—ঝগড়াটা অবশ্যই আমায় নিয়ে—

নয়না বলে উঠলো—একথা আবার কে বললো? কথার মাঝখানে মেয়ে একটা অদ্ভুত ওয়ার্ড ব্যবহার করেছিলেন, বাবা তার মানে খুঁজতে শব্দকোষ চাইলেন, তাই মেয়ে রেগে টং হয়ে—

প্রবীর বললো—এটা তো বাজে কথা। জানি রাগের কারণ

আমি। আর সেটা অস্বাভাবিকও নয়। আমাকে এবার ছাড়ে বাবা, আমার জন্যে নিজের ক্ষতি কোরো না।

নয়নার মনে হয়, এ বোধটা প্রবীরের মধ্যে জাগছে ধীরে ধীরে। প্রথমদিকে ও বলতো বটে 'আমায় ছাড়ো বাবা—' সেই বলার মধ্যে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ছিলো, অবজ্ঞা ছিলো, উগ্রতা ছিলো। এ তা নয়। এটা হৃদয়বান মানুষের সুস্থ চিন্তার মতো।

নয়না যেন একটা পরীক্ষার মার্কশীট পাচ্ছে।

নয়না সেই খুশীটা চেপে গম্ভীরভাবে বলে—বেশ না হয় ছাড়লাম। তারপর? আবার সেই কালীঘাটের বস্তি, চাওয়ালার ভাড়াটে ঘর?

প্রবীর আরো গম্ভীর হয়, বলে—যদি তাই হয়, তোমার কী এসে যাচ্ছে?

নয়না ওর চোখের দিকে স্পষ্ট তাকিয়ে বলে—কিছু না এসে গেলে এতো কষ্ট করে তোমায় ধরে বেঁধে আনলাম কেন?

প্রবীর বিষণ্ণ গলায় বলে—কেন, তাই তো ভাবি। মাথায় ঢোকে না। যদি মনে করতে পারতাম তুমি আমায় ভালোবাসো, তাহলে অঙ্কটা মিলতো। কিন্তু তা তো নয়।

নয়না শান্ত গলায় বলে—কেন নয়? বন্ধু বন্ধুকে ভালোবাসতে পারে না?

কি জানি! হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় তুমি আমায় দয়া করছো, করুণা করছো, ভয়ানক রাগ আসে তখন।

নয়না ওর কাছাকাছি সরে এসে বলে—ওসব আজেবাজে জিনিস মাথায় ঢোকাবার দরকার কী? ভালো জিনিস নিয়ে ভাবো।

প্রবীর ব্যাকুল গলায় বলে—তুমি চলে যাও কেন? তুমি না থাকলে আমার কিছু ভালো লাগে না। ইচ্ছে হয় সব ভেঙ্গে ফেলি, সব ছিঁড়ে ফেলি—

নয়না দৃঢ় গলায় বলে—এসব ভাবতে বারণ করে দিয়েছি না? আমার কাজ নেই? আমায় বেরুতে হবে না? তুমি এরকম করো, আমার মাসিমা ভয় পান।

একথা শুনে প্রবীরই হঠাৎ ভারী ভয় পেয়ে যায়, বলে—ভয় পান ?

তা পাবেন না ? উনি ভাবেন, তুমি হয়তো নেশাটেশা করো—

প্রবীর রেগে দাঁড়িয়ে উঠে বলে—নেশা করি ? আর মদ খাই আমি ?

পাও না তাই। পেলে কী করতে কে জানে !

প্রবীর ক্ষুব্ধ গলায় বলে—আমি না তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি ?

এমনভাবে বলে যেন ওই প্রতিজ্ঞাটা অমোঘ। ওকে ছাপিয়ে কিছু হতেই পারে না।

কেন কে জানে, নয়নার চোখে জলের আভাস এসে যায়।

নয়না বলে—প্রবীর, তোমায় যা বলেছি, সেটা করো।

প্রবীর অবাক হয়ে বললো—কী বলেছো ?

একদম ভুলেই গেছো ? ভাবো, ভাবো ?

প্রবীর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে একটুক্ষণ। নয়নার চোখে মুখে এখন চাপা কৌতুকের হাসি।

একটু তাকিয়ে থেকে প্রবীর বলে—ওঃ সেই কথা ? প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে কলেজ জীবনের কথা ভাবা।

হ্যাঁ। কলেজে ভর্তি হবার দিন থেকে শুরু করে প্রতিদিনের কথা ভাববে। সেখানে কী পড়েছো, কী শিখেছো, কাকে দেখেছো, কোন্ প্রফেসরের ক্লাশ ভালো লেগেছে, কিন্তু খবরদার, কলেজ থেকে বাড়িতে ফিরে আসবে না, কিছুতেই না।

প্রবীর যেন যন্ত্রের মতো বলে—না, কিছুতেই না। সেখানে পুতুল আছে।

এই তো ! ঠিক আছে !

নয়না, ভাগ্যিস তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়ালে. ভাগ্যিস আমায় নিয়ে এলে—

নয়না চাপা হাসির মুখে বলে—তাতে কী হলো ?

তাতে ? তাতে তো সবই হলো নয়না !

প্রবীর যেন ঠিকমতো ভাষা খুঁজে পায় না, তারপর বলে—হ্যাঁ তাতে আমার সব রাগ চলে যাচ্ছে।—পৃথিবীর সব মেয়ের ওপরই আমার রাগ এসে গিয়েছিলো।

নয়না প্রসঙ্গ হাল্‌কা করে ফেলতে হেসে বলে—যাক, পৃথিবীতে এসে মানব জন্ম ধারণ করে একটা মহৎ কাজ করে গেলাম তাহলে—

গেলাম অবশ্যই কথার কথা, কিন্তু অবুঝ প্রবীর চমকে উঠে বলে —গেলাম মানে ? কোথায় যাবে ?

কোথায় ?

নয়না তার খঞ্জন নয়ন নাচিয়ে বলে—সেটা তো বলতে পারবো না। আজ পর্যন্ত কেউ কি সঠিক বলতে পেরেছে 'প্রাণী সকল কোথা হইতে আসে, কোথায় যায়।'

প্রবীর যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে—ওঃ এই কথা ? আমার এমন ভয় ধরে গিয়েছিলো ! মনে হলো তুমি বোধহয় কোথাও চলে যাবে।

নয়না গম্ভীর কৌতুকের হাসি হেসে বলে—আমি চলে যাবার নামে তোমার এতো ভয় ? বাব্বা ! তা আমার বুঝি শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে না ?

প্রবীর বলে উঠলো—য্যাঃ।

ও মাই গড ! য্যাঃ মানে শ্বশুরবাড়ি যাবো না ? বর ছাড়বে ? নিয়ে যাবে না ?

প্রবীর চকিত হয়ে বললো—কই বর ?

আহা ! বরকে কি আমি ভ্যানিটি ব্যাগে পুরে রেখেছি ? বিয়ে হলে তবে তো ?

প্রবীর অবুঝ গলায় বলে—তোমার বিয়ে করা চলবে না।

সেরেছে !

নয়না কৌতুকে চোখ নাচিয়ে বলে—বিয়ে করা চলবে না মানে ?

তবে কি আমি রত্নাটার মতো চিরকাল একই বাড়িতে থেকে যাবো নাকি?

জানি না। তোমার কোথাও যাওয়া চলবে না। তাহলে আমি চলে যাবো। আমি মরে যাবো।

নয়না শাসনের সুরে বলে—প্রবীর! আবার পাগলামী? এতোক্ষণ এতো ভালো ভালো কথা বললে, আর—

তুমি কোথাও চলে যাবে শুনলে আমার সব গোলমাল হয়ে যায়। তুমি বিয়ে করবে না।

নয়না এখন কৌতুক থামিয়ে বলে—ওকথা বলতে হয় না প্রবীর। আমরা বলে কতোদিন থেকে ঠিক করে রেখেছি—

প্রবীর উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী করতে করতে বলে—কার সঙ্গে ঠিক করেছো শুনি? দীপকটার সঙ্গে তো? ও একটা রাবিশ ছেলে—

নয়না চোখ পাকিয়ে বলে—এই খবরদার! ও আমার ভাবী বর না? ও একজন কবি।

কবি হলেই ভালো হয় তার মানে নেই। ও ভালোবাসার কিছু জানে না।

নয়না ওর সঙ্গে সহজ হতে চায়। নয়না ওর সঙ্গে আগের মতো করে কথা বলতে চায়। তাই বলে—তা বেশী না জানাই ভালো বাবা। বেশী ভালোবাসাটা একটা বন্ধন, গলায় ফাঁসের মতো লাগে।

প্রবীর বললো—তার মানে?

মানে হচ্ছে—

মানে বোঝানো হলো না।

মানে বোঝাবার সময় হঠাৎ দীপক এসে পড়লো।

বড় রাস্তা থেকে ভিতরে ঢুকে এসে গলির মধ্যে বাড়ি। একতলার বাইরের দিকের ঘর। দরজাটা খোলাই ছিলো, কাজেই ঢোকাটা হলো বিনা নোটিশে। দীপককে দেখেই প্রবীর সকালে পড়ে ফেলে রাখা খবরের কাগজখানা মুখের সামনে তুলে ধরলো। দীপক অবশ্য সেদিকে

দৃকপাত করলো না, খুব সহজ ভঙ্গীতে তাড়াতাড়ি বললো—নয়না, রঙ্গনায় একটা নতুন নাটক হচ্ছে শুনছি নাকি দারুণ বই। টিকিট কেটে আনলাম, চটপট তৈরি হয়ে নাও। পাঁচটা বেজে গেছে। সাড়ে ছটায় শো—

যেমন আগেও বলেছে অনেক সময়।

এটাই স্বভাব দীপকের।

টিকিট কাটার আগে জানাবে না।

এসেই তাড়া লাগাবে।

নয়না যে এতে কখনো কখনো রাগ করতো না তা নয়, বলতো —আমাকে কি তোমার খাস তালুকের প্রজা পেয়েছো নাকি যে হুকুম হলেই হাজির হতে হবে? আমার অন্য কাজ থাকতে পারে—

দীপক হেসে জবাব দিয়েছে—ঠিক এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে নাটক দেখতে যাওয়া ছাড়া তোমার আর কোনো কাজ থাকতে পারে না।

তার মানে স্থিরীকৃত হয়ে গেল—খাস তালুকের প্রজা।

উঁহু! স্থির হলো খাসমহলের রাণী!

কিন্তু আজ আর নয়না রাগ দেখালো না, হয়তো দেখাতে সাহস পেলো না।

শুধু প্রবীরকে বড্ড অগ্রাহ্য করা হচ্ছে মনে করে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—দেখেছো প্রবীর, তোমাদের ছেলেদের কাণ্ড! একেবারে টিকিট কেটে এনে হাজির! মেয়েদের যে প্রসাধনের জন্যে খানিকটা সময় দিতে হয় সে জ্ঞানটুকুও নেই।

প্রবীর উঠে দাঁড়ালো। এই প্রসঙ্গে কোনো কথা না বলে বললো —আমি একটু আসছি—বলে ভিতর উঠোনে নেমে স্নানের ঘরের দিকে চলে গেলো।

আত্মরক্ষার জন্যে এর চাইতে ভালো দুর্গ বোধহয় আবিষ্কার করতে পারলো না।

দীপক মুচকি হাসলো একটু।

ও চলে যেতে নয়না দীপকের দিকে অভিযোগের অথচ কুণ্ঠা-দৃষ্টি ফেলে বললো—আচ্ছা, তোমার কী আক্কেল বলতো? এভাবে ওর সামনে—একসময় ও তো তোমারও বন্ধু ছিলো? তিনটে টিকিট কেটে আনলে দেখতে কতো ভালো হতো।

দীপক অগ্রাহ্যের গলায় বললো—তোমরা মেয়েরা ভালো দেখানো আর মন্দ দেখানোর মতো একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে যতো মাথা ঘামাও আমরা তা ঘামাই না। আমাদের মাঝখানে তৃতীয় ব্যক্তি কেন?

কী আশ্চর্য! পাবলিক প্লেসে আবার তৃতীয় ব্যক্তি কী? ছবি-টবি দেখতে কতো সময় আমরা অন্য বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে যাই না?

কতো সময় যাই, এই সময় যাবো না, ব্যস!

উঃ কী মেজাজ!

বলে চলে গেলো নয়না ভিতরে।

অন্ততঃ শাড়িটা তো পালটে আসতে হবে!

নয়না চলে যেতে ফাঁকা ঘরটার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো দীপক। ঘরটাকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করা হয়েছে প্রবীর নামের এক পাগলাকে। একজন পুরুষের একক কক্ষ ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত তেমনটি করেই সাজানো-গোছানো হয়েছে। অবশ্যই গেরস্থালীভাবে, কিন্তু পরিপাটি।

দেখে দেখে একটা ঈর্ষার জ্বালা অনুভব করলো দীপক।

এই ঘরে দীপক আগে এসেছে, বসেছে, পত্রলেখার হাতে চা খেয়েছে। কেমন সহজ স্বাচ্ছন্দ্য ছিলো তখন জীবন। আর এখন? দীপক যেন এঘরে বহিরাগত। কে যেন অন্তর্লোকে বসে বলছে 'এটা তোর জায়গা নয়'।

দীপক ভাবলো, আমায় শক্ত হতে হবে। এতোদিন রাগ করে উদাসীনের ভান দেখিয়ে খুব ভুল করেছি।

অকারণ স্নানের ঘরে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে

প্রবীরের মনে হলো যেন অনন্তকাল ধরে এরকম বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে সে।

এতোক্ষণ নিশ্চয় চলে গেছে ওরা।

হয়তো থিয়েটার দেখতে শুরু করে দিয়েছে। বেরিয়ে এলো। এসেই দরজার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। ঘরে দীপক একা।

নয়নার কী হলো? নয়না কোথায় গেলো? ভারী ব্যাকুলতা অনুভব করলো কিন্তু বলতে পারলো না কিছু। শুধু দেখতে লাগলো এপাশের ভিতর ঘরের দরজায়।

দীপক ঈষৎ মমতাবোধ করলো।

বললো—আয় বোস। নয়নার কাণ্ড দেখছিস তো? খুব জোর গলায় বললো—সাজতে একটু সময় লাগবে! দেখ, এখনো চলছে সে পর্ব।

প্রবীর শুধু বললো—হু।

দীপক বললো—সত্যি, একটু ভুলই হয়ে গেল। তিনটে টিকিট কেটে আনলে বেশ তিনজনে চলে যাওয়া যেতো।

এখন প্রবীর স্পষ্ট গলায় কথা বললো।

বললো—আমাকে অবশ্য তোমরা পাগলই বল দীপক, তবু আমি পুরো পাগল নই এইটুকু অন্ততঃ মনে রাখলে খুশী হবো।

দীপক বললো—আমরা তোকে পাগল বলি একথা ভাবছিস কেন?

দীপকের কণ্ঠে আবার মমতার সুর।

এখন নয়না সামনে নেই তাই হয়তো এই মমতাটুকু ছোট্ট একটা ঘুলঘুলির ধারে এসে উঁকি মারলো। নয়না সামনে থাকলে মন বদলে যায়, প্রবীরের উপর আক্রোশ আসে, হৃদয়ের দরজায় তালা পড়ে যায়।

দুজন পুরুষের মাঝখানে একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালেই পরিস্থিতি পালটে যায়। মমতা বিদায় নেয়, বিদায় নেয় সভ্যতা ভব্যতা চক্ষুলজ্জা।

এখন এঘরে এক টুকরো শান্ত মমতা যা করুণার ছায়া বিছিয়ে দিতে চাইছে তা এই মুহূর্তে নষ্ট হয়ে যাবে। দুজন পুরুষ পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠুর হবে, হিংস্র হবে।

প্রথমটা একটা গভীর স্তব্ধতা। কেউ কথা বলছে না।

ট্যাকসিটা অনেকক্ষণ যাবার পর নয়না হঠাৎ চকিত হয়ে বললো—আমরা কোথায় যাচ্ছি?

দীপক বললো—যেদিকে দুচোখ যায়।

বাঃ, রঙ্গনায় নয়?

মোটেই না।

শুধু শুধু বাজে কথা বললে?

দীপক নয়নার পিঠের দিকে হাতটা ছড়িয়ে একটু চাপ দিয়ে গম্ভীরভাবে বললো—শুধু শুধু?

বাঃ, থিয়েটার দেখতে নিয়ে যাবে না বললে বুঝি আসতাম না আমি?

সন্দেহ ছিলো। হয়তো বলতে 'আজ থাক, কাল গেলেই হবে। আজ বরং এসো তিনজনে গল্প করি—'

নয়না হেসে ফেলে বলে—তা হয়তো বলতাম।

জানি।

বলে দীপক হাতটায় আর একটু চাপ দেয়।

নয়না খুব আস্তে করে বলে—ড্রাইভারের চোখের সামনের আর্শিটা বেশ বড়ো মাপের।

আচ্ছা, খুব হয়েছে, আর জ্ঞান দিতে হবে না। আচ্ছা, বেশ, ভূমিকায় কাজ নেই, সোজা কথাতেই আসি। আর কতোদিন এভাবে পাগলামী চালিয়ে যাবে?

আমি তো বলেছিলাম দীপক, আমি একটা এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করতে চাই—

তা সেটা কি অনির্দিষ্টকাল?

নয়না ম্লানভাবে বলে—ওকথা বলছো কেন দীপক? মাত্র তো পাঁচ মাস আমাদের কাছে রয়েছে প্রবীর!

দীপক উত্তেজিত গলায় বলে—আমার মনে হচ্ছে পাঁচ বছর, দশ বছর! মোট কথা, আমি আর পারছি না। অসহ্য লাগছে।

নয়না স্থির গলায় বলে—পরীক্ষার হল-এ বসে প্রশ্নপত্র ফেলে দিয়ে উঠে আসবো দীপক? এটাই চাইছ তুমি? তুমি জানো না, এই কমাসের মধ্যে ওর কতোখানি উন্নতি হয়েছে। মদ ছেড়েছে ও—

দীপক ব্যঙ্গের গলায় বলে—ছেড়েছে! হুঁ! ঘরে বন্দী করে আঁচলে বেঁধে রেখে দিয়েছো। পায় না, তাই ছেড়েছে! মাতাল আবার মদ ছাড়বে!

সেটাই তো আমার এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট দীপক। মাতাল মদ ছাড়লো, পাগল পাগলামী ছাড়লো, এটা সম্ভব সেটাই দেখতে চেয়েছি। সত্যিই মদ ছেড়েছে ও। দেখো ওর খাটের তলায় এখনো অবশিষ্টাংশ সমেত দু-একটা বোতল পড়ে আছে। আমি ইচ্ছে করে সরাইনি। টেনে নিয়ে খায় না। তাছাড়া দাদুর কাছে সংস্কৃত শিখছে ও, তা জানো? দাদু তো বেজায় খুশী। বলছেন 'এতো তাড়াতাড়ি শিখছে—'

দীপক অসহিষ্ণুভাবে বলে—সব বুঝলাম, কিন্তু একটা পাগলকে সুস্থ করে তুলতে যদি আর একটা সুস্থকে পাগল করে তোলা হয়, তা হলে রেজাল্টের ঘরে জিরো ছাড়া আর কী পাচ্ছো?

নয়না প্রসঙ্গ হাল্‌কা করতে চায়, নয়না বলে, বিয়েটা এই দণ্ডে না হয়ে কিছুদিন পরে হলে তুমি পাগলা হয়ে যাবে, নিজের প্রতি এই বিশ্বাস তোমার?

হয়ে যাবো কি হতে শুরু করেছি সেটাই ধরতে পারছি না এখনো। আমি বলছি নয়না, তুমি আগুন নিয়ে খেলছো। এ খেলা তুমি ছাড়ো।

নয়না গম্ভীর হয়।

বলে—তুমি এই কথাটা কেন কিছুতেই মানতে পারছো না দীপক, এটা আমার খেলা নয়। আমার প্রতিজ্ঞার জিদ।

কিন্তু ভুলে যেও না তুমি একটা মেয়ে। চারিদিকে তোমার নামে যা সমালোচনা শুরু হয়েছে, তাতে আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে।

আশ্চর্য লাগে দীপক। মেয়ে হয়ে জন্মানোর অপরাধে একটা সৎ কাজ করবার অধিকারও থাকবে না?

দীপক বলে—তুমি ভুল করছো নয়না। এটা সমাজে থাকার ট্যাকস। শুধু মেয়ে কেন, পুরুষদেরও বদনাম হয়। ধরো আমি কোনো এক পতিতা মেয়েকে ঘরে নিয়ে এসে তার উদ্ধারকার্যে লেগে গেলাম, কেউ কি ভালো চক্ষে দেখবে? কেউ—এবং তুমি?

আমাকে তুমি আজ অবধি চিনতে পারলে না দীপক।

দীপক আস্তে আস্তে বলে—হয়তো তাই। হয়তো এতোদিন কোনো উল্টোপাল্টা অবস্থায় পড়িনি বলেই ভেবে এসেছি চিনে নিয়েছি তোমায়। কিন্তু এইটাই শুধু আমার জানবার বিষয় নয়না, কী ক্ষতি হতো আমাদের সেই সহজ সরল জীবনটার মধ্যেই থেকে গেলে? তোমার গান, আমার কবিতা, একি আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারতো না? কেন এই রিস্ক নেওয়া? কী লাভ হবে এতে?

নয়না একটু হাসে।

বলে—সমতলের মানুষ কেন হিমাচলের চূড়োয় ওঠবার বাসনায় জীবন-সংশয়ের পথে পা বাড়ায়!

দীপক রেগে ওঠে। বলে—তুলনাটা যুক্তি নয় নয়না। আমি যদি বলি প্রবীরের ওপর তোমার একটা আকর্ষণ আছে?

নয়না শান্ত হাসি হেসে বলে—বলো।

সেটা আমি সহ্য করতে রাজী নই।

তা হলে কী করতে চাও? ওকে খুন করবে? না আমায় লুঠ করে হারেমে পুরে ফেলবে?

তোমায় ওকে ছাড়তে হবে।

নয়না হেসে ফেলে বলে—কী মুস্কিল। দিনদিন তুমিও যে স্রেফ একটা গোঁয়ার হয়ে যাচ্ছো। আমি কি বলছি চিরকাল আমি ওকে ধরে বসে থাকবো, ছাড়বো না? ভালো হয়ে গেলে ও নিজেই চলে যাবে। এখনই তো রোজ বলে, 'আমায় ছেড়ে দাও।'

দীপক একটু গুম হয়ে থেকে বলে—ওর ভালো হওয়ার প্রমাণটা কীভাবে পাওয়া যাবে?

কীভাবে আবার? নিজেকে খুঁজে পাবে ও। কাজকর্ম করবে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমি বলছি কিচ্ছু হবে না—দীপক রাগী গলায় বলে—তোমার সহানুভূতি কাড়বার আশায় চিরদিন পাগল সেজেই থাকবে।

নয়না দৃঢ় গলায় বলে—আচ্ছা বেশ, আর ছটা মাস সময় দাও আমায়।

আর ছয়টা দিনও সময় দিতে ইচ্ছে নেই আমার নয়না, আমি আর পেরে উঠছি না। ঘরে-বাইরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছি আমি।

নয়না হেসে উঠে বলে—তাহলে তো আরো একটা পরীক্ষার ফলাফল পেয়ে যাচ্ছি হে মশাই! তোমার প্রেমের গভীরতার এবং দৃঢ়তার পরীক্ষা।

দীপক হতাশ গলায় বলে—নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছি না নয়না।

ছিঃ, দীপক! তোমার মুখে একথা শুনতে রাজী নই। আমরা তো আমরাই আছি?

দীপক গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে—মাঝে মাঝে ভয় হচ্ছে—আছি কি না।

নয়না আস্তে ওর হাতের ওপর একটা হাত রেখে ঈষৎ চাপ দিয়ে বলে—আছি দীপক।

এই সময় ড্রাইভার জিগ্যেস করে কোন্ দিকে যাবে।

দীপক নিশ্বাস ফেলে বলে—চলো ফেরা যাক।

বাঃ, এক্ষুনি ফিরলেই হলো? রঙ্গনায় গিয়ে থিয়েটার দেখে,

ফেরার টাইমটা কাভার করতে হবে না? নাহলে ভালো দেখাবে কেন?

দীপক ক্ষুব্ধ গলায় বলে—আবার সেই ভালো দেখানো—কার কাছে এতো ভালো দেখানোর প্রশ্ন?

নয়না বলে—মাসিমণিকে বলে এলাম না বুঝি?

দীপক বলে—তা তুমি তো মিছে কথা বলো না।

বলি না আবার?

নয়না খুব হাল্‌কা গলায় হেসে ওঠে—তোমার জন্যে কম মিছে কথা বলতে হয়েছে এ যাবৎ? দস্তুরমতো মিছে কথার চাষ চালাতে হয়েছে। কিন্তু কী জানো? তাতে যেন ভার লাগে না, মনে হয় মজা করছি।

ট্যাকসিটাকে ছেড়ে দিয়ে ওরা ওদেব চিরকালের কফি হাউসে এসে ঢোকে।

দেখে রত্না আর শান্তনু।

রত্না ওকে দেখে হে-হে করে ওঠে—কীরে নয়না, আবার তুই দীপকটার সঙ্গে? তুই না ওকে তালাক দিয়েছিলি?

নয়না হেসে বলে—দিয়েছিলুম বুঝি? কবে বল্‌তো?

আরে বাবা, কে না জানে, তুমি এক পাগল নিয়ে ভেসে যাচ্ছো—

নয়না কৌতুকে চোখ নাচিয়ে বলে—গেলেই হলো? আমায় এই দণ্ডমুণ্ডের কর্তাটি দেবে যেতে? চুলের মুঠিটা ধরে ও টেনে ডাঙ্গায় তুলবে না?

ওরা হেসে ওঠে।

শান্তনু বলে—বাবা তবু বাঁচলাম। সত্যিই ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলি। তা বিয়েটা করে নেনা বাপু, চটপট।

দাদুকে কথা দিয়েছিলাম রিসার্চটা শেষ না করে বিয়ের পিঁড়িতে বসবো না।

দীপক বলে ওঠে—ও রিসার্চ আর শেষ হয়েছে তোমার। ওর বারোটা বেজে গেছে—।

নয়না আত্মস্থ গলায় বলে—বললেই হলো। তারপর রত্নার দিকে তাকিয়ে বলে, দীপকের কাছে আর ছটা মাস সময় নিয়েছি আমি। এই ছয় মাস কালের মধ্যে আমার পেপার সাবমিট করবো, এবং আমার রোগীকে সুস্থ জীবনের মধ্যে ফিরিয়ে দেব। ব্যস! জানিস ও মদ ছেড়েছে?

রত্না হেসে গড়িয়ে পড়ে বলে—তার মানে মদের থেকে হায়ার নেশায় মজে আছে। সেটা ছাড়লে তবে তো বুঝি।

শান্তনু হেসে ওঠে।

নয়না ওদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে—নেশা তত্ত্বের ব্যাপারে অবশ্য তোরা হচ্ছিস ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট।

দীপক বলে—সত্যি শান্তনু, ভেবে পাই না তোদের ব্যাপারটা কী! তুতো-টুতোর মধ্যে বিয়ে হওয়ার তো চল হয়ে গেছে বাবা আজকাল।

শান্তনু গম্ভীর হাসি হেসে বলে—সে প্রশ্ন রত্নাকে কর। ও নাকি এরকম বিয়ের মধ্যে আঁসটে গন্ধ পায়।

ভাষাটা হাস্যকর।

হেসেই ওঠে সবাই।

দীপক বলে—কিন্তু ভবিষ্যৎটা কী?

রত্না মৃদু হেসে বলে—ভবিষ্যতের কথা কি কেউ বলতে পারে? শুভেন্দুর কথা শুনেছো তো? এই সেদিন প্রেমে একেবারে গড়াগড়ি দিয়ে বাড়ির সঙ্গে বচসা করে বিয়ে করলো, এখন শুনছি সেপারেশান চলছে।

ফেরবার সময় আবার ট্যাকসিতে শুভেন্দুর প্রসঙ্গে দীপক বলে—তাহলে বলতে হবে ভালোবাসা জিনিসটা কিছু নয়?

নয়না আস্তে বলে—কার কাছে কি তা জানি না দীপক, আমার কাছে ভালোবাসার একটাই মানে। সেই মানেটার নাম হচ্ছে জীবন।

নয়নার কাছে ভালোবাসার একটাই মানে তাই নয়না নিশ্চিত হয়ে দীপকের কাছে ছ মাস সময় চায়।

কিন্তু ছ মাস সময় কি এক অসহিষ্ণু পুরুষ চিত্তের কাছে খুব সহজ।

বিধুশেখর বলেন—প্রবীর, তুমি তো ইংলিশে এম-এ। বেশ একটা নতুনত্ব হবে, সংস্কৃতে ডিপ্লোমা পরীক্ষাটা দিয়ে দাও।

বিধুশেখরের কাছে প্রবীরের একটা আশ্চর্য চেহারা। উত্তাল নয়, অবুঝ নয়, আবেগক্ষুব্ধ নয়। শান্ত স্থির জিজ্ঞাসু ছাত্রের মূর্তি।

প্রবীর বলে—আপনার কী মনে হয় পারবো?

নিশ্চয় পারবে।

পানাপুকুরের পানা সরিয়ে ফেললে আবার যেমন ভিতরের পরিষ্কার জল জেগে ওঠে, প্রবীরের বুদ্ধিবৃত্তিতেও বুঝি তেমনি একটা কাজ শুরু হচ্ছে।

ক্রমশই অনুভব করছে সে যে এখানে এইভাবে থাকাটা অশোভন। থাকাটা নির্লজ্জতা।

ভাবছে এখান থেকে চলে যেতে হবে।

প্রাণ মুচড়ে ছিঁড়ে গেলেও যেতে হবে। কিন্তু শুধুই কি নয়নার জন্যে এই প্রাণ ছিঁড়ে পড়া? নয়নার জন্যে প্রবীরের যে আবেগ আকর্ষণ আসক্তি সে যেন আগুনের প্রতি পতঙ্গের মতো। কিন্তু এই একটা খাপছাড়া পরিবারের কাছ থেকে আরো যা পেয়েছে প্রবীর সে পাওয়ারও তুলনা নেই।

শৈশবে মা-বাপ মরার পর গৃহাশ্রিত প্রবীর কবে স্নেহ মমতা পেয়েছে?

খাপছাড়া তো বটেই, 'সংসার' বলতে যা বোঝায়, পরিবার বলতে যা বোঝায়, এখানে তো তার কিছুই নেই। কিন্তু ওই এক পণ্ডিত বৃদ্ধের মধ্যে কী অপরিসীম স্নেহ, ওই এক বালবিধবা মহিলার মধ্যে কী অগাধ মমতা!

আস্তে আস্তে চেতনার উন্মেষ ঘটতে থাকে, প্রথমদিকের কথা মনে পড়ে প্রবীরের।

বিধুশেখরের সামনে বোতল নিয়ে বসেছে প্রবীর, বিধুশেখর

নিষেধ করে ওঠেননি, রেগে উঠে চলে যাননি, শুধু একসময় বলেছেন —তোমার এতো স্বাস্থ্য খারাপ, এটা যতটা সম্ভব কম খাওয়া উচিত।

এখন ভাবলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়, প্রবীর তখন ওঁকে যা তা বলেছে।

আর বিধুশেখর বলেছেন—জিনিসটার অপকারিতা দেখছো তো বাবা? আমি একজন বয়োবৃদ্ধ লোক। আমায় তুমি ওর প্রভাবে যা তা বলেছো। এমনিতে কি পারতে?

প্রবীর তখন যেন হঠাৎ চুপ করে গেছে।

আর পত্রলেখা?

তাঁর হাতেই তো খাওয়া-দাওয়া। তাঁকে তো আসতেই হতো সামনে। তিনি ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে সামনে আসতেন, আর আস্তে আস্তে বলতেন—মাতাল দেখলে আমার বড়ো ভয় করে নয়না।

কিন্তু আশ্চর্য, ঘৃণা করেননি কোনোদিন।

কথাগুলো মনে পড়ে গেলে লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করে। মদের জন্যে কী রাগারাগি করেছে নয়নার সঙ্গে। নয়না বলেছে—তুমি যদি ভালো না হও আমি দারুণভাবে হেরে যাবো প্রবীর। তুমি কি আমায় হেরে যেতে দেবে?

প্রবীর আস্তে মাথা নেড়েছে।

কিন্তু দীপকই কি হেরে যাবে?

দীপক হঠাৎ হঠাৎ এসে হাজির হয়, যখন তখন যোগাযোগ ঘটায় আর বলে—নয়না, তুমি কি শেষ পর্যন্ত আমায় খুনী করে তুলবে? আমি নিজের ওপর আর বিশ্বাস রাখতে পারছি না। রাস্কেলটা তো আজকাল বেরোচ্ছে দেখছি। সেদিন দেখলাম কলেজ ষ্ট্রীটে একটা পুরনো বইয়ের স্টলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বই ওলটাচ্ছে। ইচ্ছে হলো, পিছন থেকে একটা ছুরি-ফুরি বসিয়ে দিই ভবলীলা সাঙ্গ করে। হাতে থাকলে কী হতো বলা যায় না।

নয়না হেসে উঠে বললো—এ মা, তুমি এমন কাপুরুষ। পিছন থেকে? সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারলে না, আয়রে পাপিষ্ঠ পামর

সম্মুখ সমরে। এই ধরা ধামে হয় জগৎ সিংহ থাক, নয় ওসমান থাক।

তোমার হাসি আমার অসহ্য লাগে নয়না।

নয়না বলে—এই সেরেছে! এক সময় তুমি না বলেছিলে, 'নয়না তোমার ওই হাসিটার কাছেই জান বিকিয়ে দিয়েছি'?

সে দিনের কথা ছেড়ে দাও।

দীপক বলে—এখন জীবনের রং বদলে গিয়েছে।

নয়না এখন হাসে না, গম্ভীর হয়ে বলে—এতো সহজে জীবনের রং বদলাতে নেই দীপক। আমি একটা—শুধু আমিই বা বলি কেন, আমার পরিবার একটা নিঃসহায় অসুস্থ হতভাগ্যকে আশ্রয় দিয়ে তাকে সারিয়ে তুলতে চেয়েছে, এইটুকুতেই তোমার জীবনের রং বদলে যাবে? তুমি যদি সেদিন খুনের ইচ্ছে পোষণ না করে ওর সঙ্গে কথা বলতে দীপক, দেখতে অনেক নর্ম্যাল হয়ে গেছে ও।

নয়না উৎফুল্ল যে প্রবীর নর্ম্যাল হয়ে উঠছে।

কিন্তু আর পাঁচজনে যে নয়নাকে অ্যাবনর্ম্যালের দলে ফেলেছে সে খেয়াল নেই।

একদিন দল বেঁধে চলে এলো জয়তী নবীনা কৃষ্ণা আর গাইড হিসেবে রত্না।

ভাষা ভঙ্গী বিভিন্ন হলেও তাদের বক্তব্য একই।

নয়নার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

নয়নাকে কেউ তুকতাক করেছে?

নয়নার বাড়ির লোক কি নয়নাকে আউট বলে ত্যাগ করে দিয়েছে? নয়নার মাও কি মেয়ে সম্বন্ধে এমনই উদাসীন যে মেয়ে কী করছে না করছে দেখছেন না?

তা নইলে নয়না কিনা দীপকের সঙ্গে এতোদিনের ভালোবাসায় জলাঞ্জলি দিয়ে—

নয়নাও প্রশ্ন করেছে।

প্রশ্নের বিষয়বস্তু হলো দীপকের সঙ্গে যে নয়না এতোদিনের

সম্পর্কে জলাঞ্জলি দিয়ে বসে আছে, এই গোপন অথচ সঠিক খবরটি তারা পেলো কোথায়? প্রশ্ন করেছে, নয়নার মাথা খারাপের প্রশ্নে তারা তাদের মাথাগুলো খারাপ করছে কেন, আর বলেছে নিশ্চিন্ত থাক বাবা, নেমন্তন্ন ফসকাবে না।

তত্রাচ এরা ধিক্কার দিয়েছে নয়নাকে এবং দীপকের প্রতি সাহানুভূতিতে বিগলিত হয়ে তার সহ্যশীলতার ভূয়সী প্রশংসা করেছে।

রত্না তো রেগে এও বললো—সোনা দানা মণিরত্ন বেওয়ারিশ ফেলে রাখলে খোয়া যাবার ভয় থাকে।

কিন্তু আশ্চর্য, নয়নার ভয় নেই।

এরা অনেক বকাবকি করে, অনেক চা আর খাবার খেয়ে এবং অনেক সৎ পরামর্শ দিয়ে বিদায় নিলো আর বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোতে না ডিঙোতে ঘোষণা করলো—সব পরামর্শই বিফলে যাবে, আসল ব্যাপার বোঝা গেছে।

আর কিছু নয়, ওই উচ্ছন্ন যাওয়া প্রবীরটাই গ্রাস করে বসেছে নয়নাকে। তাই টালবাহানা করে সময় নিচ্ছে। রিসার্চের কাজটা শেষ হওয়া একটা ছুঁতো। বিয়ে হওয়ামাত্র দীপক যেন ওর কাগজ-কলম কেড়ে নিতো।

কিন্তু দু-একজন বললো—নয়না সম্পর্কে এরকম ভাবা যায় না। ওকে অনেক বস্তু সম্পন্ন বলে মনে হতো—আরে রেখে দাও তোমার 'বস্তু'। প্রেমের ফাঁদের কাছে কিছু নয়। রংটা কালো, চেহারাখানা তো প্রবীরের দীপকের থেকেও ভালো। মাঝে গোল্লায় গিয়ে বিশ্রী হয়ে গিয়েছিলো। আবার শ্বশুরবাড়ির আদর খেয়ে চেকনাইটি খুলেছে কেমন।

কেউ কেউ আবার এ তথ্যও ফাঁস করলো, বরাবরই নয়নার প্রবীরের প্রতি আকর্ষণ ছিলো, শুধু প্রবীরই তখন নিহত নায়ক। তাই সুবিধে করতে না পেরে দীপকের গলায় ঝুলতে গিয়েছিলো। এখন আবার অনুকূল বাতাস পেয়ে—

আরে বাবা, পুরনো আকর্ষণ থাকুক আর না থাকুক এই এতো-দিনের নিবিড় ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের ফলাফল নেই? বলে বিবাহিতরাই এড়াতে পারে না এরকম।

ক্রমশঃ দৃষ্টান্ত উপস্থাপনার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলো. কে কবে কোথায় স্বামীর বন্ধুর অথবা স্ত্রীর বান্ধবীর প্রেমে মজে গিয়েছিলো কেবলমাত্র দু-দশদিনের কাছাকাছি বসবাসের বিপাকে পড়ে, কে স্বামীর দিন টুরে যাওয়ার অবকাশে স্বামীর অধস্তনের সঙ্গে রীতিমতো ইয়ে ইয়ে হয়ে গিয়েছিলো, আর কে কোথায় স্ত্রীর নার্সিং হোম যাবার অবকাশে বাড়ির মেড সার্ভেন্টকে নিয়ে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এতো রসালো খবর যে ওদের স্টকে ছিলো তা আগে বোঝা যায়নি। কে কাকে হারায়! যাক প্রতিযোগিতায় কেউ জিতুক বা না জিতুক সর্ববাদী সম্মতিক্রমে স্থির হয়ে গেলো দীপকের কপাল পুড়েছে। এবং নয়না মরেছে।

এদিকে আরো একজন মরতে বসেছে।

সে হচ্ছে পত্রলেখা!

মোদো মাতাল ছেলেটাকে বাড়িতে নিয়ে আসার জন্যে যে পত্রলেখা তার বাবার বিবেচনার প্রতি আস্থা হারাতে বসেছিলো, আর বোনঝির অসম সাহসিকতায় ক্ষুব্ধ হচ্ছিলো, সেই পত্রলেখা যে কেমন করে সেই ছেলেটাকে এতো ভালোবেসে ফেললো!

পত্রলেখা ওর জন্যে মমতায় মরে যায়, স্নেহে বিগলিত হয়।

ক্রমশঃ তো নয়না অভিযোগ করতে শুরু করেছে, পত্রলেখা ঘরের মেয়েটার থেকে অনেক বেশী ভালোবাসছেন ওই পরের ছেলেটাকে। পত্রলেখা অস্বীকার করে না, বলে—তা বাসছি। তুমি আহ্লাদী স্নেহ মমতা গায়েই মাখো না, হাঁসের মতো পাখা ঝাঁপটে ফেলে দাও, আর ও? ও এই মাতৃহৃদয়ের মর্ম বোঝে, পরম মূল্য দেয় তাকে। হয়তো কেবলমাত্র নয়নার প্রতি একটা অন্ধ আর তীব্র আকর্ষণই ওই পাগলা বনে যাওয়া ছেলেটাকে নিজেকে

হারিয়ে যাওয়ার পথ থেকে রক্ষা করেনি, পত্রলেখার কোমল স্নেহময় হৃদয়ের স্পর্শ, বিধুশেখরের গভীর হৃদয়ের স্পর্শ তাকে তলিয়ে যাওয়া থেকে টেনে এনেছে।

এখন পত্রলেখা কাতর হচ্ছে ও চলে যাবে বলে।

পত্রলেখা রেগে রেগে বলছে—দু' দিনের জন্যে মায়া বাড়াতে কেন এলি তুই?

বিধুশেখর অবশ্য বলেন—ওভাবে ওর সামনে না বলাই বোধহয় ভালো পত্রলেখা, ওর মন বিচলিত হবে। ছেলেটা কখনো মাতৃ স্নেহ পায়নি।

কিন্তু যেতে তো ওকে হবেই।

না গিয়ে উপায় কী?

ভাগ্যের এক অভিনব খেলা! যোগাযোগের এক আশ্চর্য লীলা!

কটা দিন আগেই কেই-বা ভেবেছিলো, প্রবীর হঠাৎ এমন স্বাভাবিক হয়ে যাবে? সত্যি গেলো কী করে!

প্রবীর বিদেশে যাওয়ার জন্যে উঠেপড়ে তোড়জোড় করছে, প্রবীর উচ্ছন্ন যাওয়ার আগে জার্মানীতে পড়াশুনো করতে যাবার জন্যে যে স্কলারশিপটার জন্যে তদ্বির তদারক করছিলো, এতোদিন পরে হঠাৎ তার ফল ফলেছে। আশা হচ্ছে পেয়ে যাবে।

এটা একটা অদ্ভুত কাজ করলো।

প্রবীর যে ভস্ম শয্যা ছেড়ে জেগে উঠলো!

বিধুশেখর উৎফুল্ল হলেন, বললেন—তোমার সংস্কৃত চর্চাটাও বিফল হবে না ওখানে, ওই ভাষাটা চর্চার সুবিধে হতে পারে।

নয়না আনন্দে ছলছল চোখে প্রবীরের জিনিসপত্র গোছাচ্ছে আর বলছে—প্রবীর, তোমার কাছে যে আমি কী দারুণভাবে কৃতজ্ঞ! তুমি আমার পরীক্ষা পাঁশের সোনার মেডেল।

প্রবীর নয়নার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখে। হঠাৎ মনে হয় যেন বিশ্ব চরাচর স্তব্ধ হয়ে গেছে।

তারপর আস্তে জেগে উঠলো। প্রবীর বললো—শুধু এই? আর কিছু নয়?

নয়না বললো—আর যেটা আছে সেটার নাম 'আনন্দ'।

প্রবীর বললো—ওটা শুধু তোমার ভাগেই থাক, আমার ভাগে তার বিপরীতটা। কিন্তু সে কথা থাক, যাবার আগে তোমায় একটা কথা বলতে চাইছি—

নয়না মনে মনে একটু কেঁপে উঠলেও মুখে সহজ হয়—'বল'।

বলাটা কেমন শোনাবে সেটা চিন্তা করছি—

নয়না আরো সাহসের সঙ্গে বলে—চিন্তার কি আছে? কেউ আমায় ভালোবাসে একথা শুনতে আমার খুব ভালো লাগে। বলে অন্যদিকে চেয়ে।

প্রবীর হঠাৎ দু হাত দিয়ে নয়নার মুখটা নিজের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে একটুক্ষণ নিশ্চল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে—তুমি কী আশ্চর্য মমতাময়ী, তুমি কী ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর!···কিন্তু এখন সুস্থ মাথায় আর তোমায় ভালোবাসার কথা শোনাতে বসবো না নয়না। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম দীপক তোমার যোগ্য নয়।

নয়না মৃদু হেসে বললো—কে কার যোগ্য আর যোগ্য নয় তার হিসেবে কষা কি সহজ? তোমার পাড়ার সেই মেয়েটা যে একটা ফল্‌স মুক্তোর মালাওলার সঙ্গে পালিয়েছিলো তাকে কি আমরা কোনোদিন তোমার যোগ্য বলে মনে করতাম?···অথচ তুমি তার জন্যে—

প্রবীর আস্তে বলে—এখন ভাবলে অবাক লাগে। অবাক লাগে তখনও তুমি সামনে ছিলে। তখনও দীপক তোমায় নিয়ে নেয়নি।

নয়না হেসে ফেলে বলে—নিয়ে নেয়নি! ভাষাটা তো বেশ আবিষ্কার করেছো?

প্রবীর বলে—যাবার সময় কী ইচ্ছে করছে জানো?

বাঃ, তোমার কী ইচ্ছে হচ্ছে আমি কী করে জানবো?

জানতে পারছো নয়না।

নয়না কৌতুক ছেড়ে গম্ভীর হয়, বলে—হয়তো পারছি। আর পারছি বলেই বলছি সব ইচ্ছে পূরণ করতে চাইতে নেই।

জানতাম তুমি এই কথাই বলবে।

প্রবীর আগে দিল্লী হয়ে তবে বিদেশের পথে পা বাড়াবে।

প্রবীর হতাশ গলায় বলে—আজ কী মনে হচ্ছে জানো?

নয়না প্রবীরের ওই শূন্য দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে দেখে প্রবীরের আঙুলগুলো কাঁপছে। যেন এই মুহূর্তে কিছু করতে চাইছিলো, কিন্তু বুঝতে পারছে ক্ষমতা নেই পারার।

নয়না একটু সরে এসে একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বলে—জানি।

ছাই জানো।

বলছি জানি।

আমি বলছি—জানো না। কী জানো বল।

মনে হচ্ছে—নয়না দেয়ালের দিকে দৃষ্টি ফেলে বলে—মনে হচ্ছে ইস্ কী বোকামীই করেছি! পাগলামীর ছাড়পত্র নিয়ে অনায়াসেই যা খুশী বলে নিতে পারতাম, যা ইচ্ছে করে বসতে পারতাম।

প্রবীর বসে ছিলো, উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ালো। সহসা নয়নার হাত দুটো চেপে ধরে প্রায় আর্তস্বরে বললো—কী করে জানলে নয়না?

নয়না হাত দুটো ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা না করেই আস্তে বলে—গল্পে উপন্যাসে এই রকমই বলে।

হাতটা ছেড়ে দিলো প্রবীর, আবার বসে পড়লো।

প্রবীরের গাড়ির সময় হয়ে এসেছে। পত্রলেখা খাবার গোছাতে গোছাতে চোখ মুছছিলো। কিছুদিন থেকে একটি গোপন ইচ্ছে মনের মধ্যে লালিত হচ্ছিলো তার। আর মনে করছিলো বুঝি ওর ওই ইচ্ছের নৌকোটি ভাসিয়ে দেবার মতো অনুকূল হয়ে এসেছে বাতাস।

দীপক আর আসে না অনেকদিন; হয়তো রাগে, হয়তো

অভিমানে, আর সেটাই স্বাভাবিক। ঠিক এরকম ক্ষেত্রে একেবারে হৃদয়ের কপাট হাট করে রেখে দেবার মতো উদার হৃদয় কজনের থাকে?···কিন্তু যাকগে যাক, পত্রলেখার পক্ষে শাপে বর। দীপক যদি অভিমানে উদাসীন হয়ে সরে যায় পত্রলেখার ইচ্ছের গাছে ফুল ফোটে।

কিন্তু তার মাঝখান থেকে এ কী উল্টোপাল্টা হয়ে গেলো।

খাবারটা প্রবীরের সামনে ধরে দিয়ে পত্রলেখা ধরা গলায় বলে—যেই শরীরটা সারলো সেই যেন ভূতে ঠ্যাঙ্গা মেরে দূর করে দিলো।

নয়না পত্রলেখার কাঁদাকাটা চোখের দিকে তাকিয়ে পরিস্থিতি হাল্কা করে নিতে বলে ওঠে—বাঃ, ওর তো অনেকদিন আগে থেকেই মথুরায় যাবার কথা ঠিক হয়েছিলো, শুধু মাঝখান থেকে মা যশোদাকে জ্বালাতে আর কাঁদাতে—

কথা শেষ করতে পারলো না, সত্যিই কেঁদে ফেললো পত্রলেখা। বলে উঠলো—ধন্যি পাষাণপ্রাণ মেয়ে। এ সময় তোর মুখে হাসি আসছেও বা।

বিধুশেখর বললেন—প্রবীরের সঙ্গে একটু ঠাকুরের ফুল দাও পত্রলেখা।

প্রবীর হেঁট হয়ে প্রণাম করলো ওঁকে, আর ঠিক সেই সময় নয়নার মনে হলো এ যেন অন্য আর এক প্রবীর। নয়নাদের জানা জগতের প্রবীর ছিলো উদ্ধত আবিনয়া, সর্বদাই বিশ্ব নস্যাতের ভঙ্গীতে উদ্যত কিন্তু দারুণ উজ্জ্বল।

উদ্‌ভ্রান্ত অস্থির অব্যবস্থিত নেশাসক্ত যে প্রবীর সেও যেন আর এক ধরনের উজ্জ্বল ছিলো। এখন প্রবীর ভদ্র হয়েছে, শান্ত হয়েছে কিন্তু নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। জ্বলে শেষ হয়ে গেছে। জ্বলে শেষ হয়ে যাওয়া কয়লার মতো দেখাচ্ছে ওকে।···অথচ—

নয়না মনে মনে বলে—আমি ওকে সারিয়ে তুলতে পারলাম কিন্তু বাঁচিয়ে রাখতে পারলাম না। কারণ সেই জীবনটা আমি দিতে পারিনি ওকে, সেটা আমার হাতে ছিলো না।

কিন্তু ওই জীবন জিনিসটা যে কী গোলমেলে। আস্ত সুস্থ মানুষগুলো পৃথিবীতে চরে বেড়াচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না ওর পকেটে ওই জীবন নামের দুর্লভ বস্তুটা আছে কিনা।

আসলে তো ওটা ঈশ্বরের হাতেও থাকে না সব সময়। মাঝে মাঝেই ভদ্রলোক স্রেফ ফতুর হয়ে বসে থাকেন, দেবার মতো কিছু থাকে না।

তা নইলে নয়নার দীপকের কাছে চেয়ে নেওয়া ছটা মাস পূর্ণ হবার একটু মাত্র বাকি থাকতে হঠাৎ দীপক অমন একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলো কেন?

প্রবীর চলে যাবার পরদিনই দীপক আর রত্না দুজনে একসঙ্গে নেমন্তন্ন করতে এলো তাদের পুরনো বন্ধুকে।

নিমন্ত্রণপত্রটায় চোখ বুলিয়ে তো নয়নার বরফের মতো জমাট আর ঠাণ্ডা হয়ে যাবার কথা। কিন্তু নয়না তো তরল রক্তের মতোই কথার তরঙ্গ তুললো।

বললো—কা রে রত্না, বেচারা শান্তনুকে তাহলে পথে বসালি?

রত্না ফস করে বলে উঠলো—তোর দেখে শিখলাম। তারপর রত্না অপ্রতিভ ভাব ঢাকতে জোর গলায় বললো—পথে বসাবসির কিছু নেই। চিরদিনই ও আমার ভাই ছাড়া আর কিছু না। তোরাই যা তা বলতিস।

নয়না বললো—ও, ইস! তাই বুঝি?

নয়নাও হয়তো উদ্‌ঘাটিত মঞ্চে যবনিকা টানতে চাইছে।

দীপকও যেটা ঢাকবার নয় সেটাই ঢাকবার চেষ্টা করে জোর দিয়ে বললো—যেও তাহলে নয়না। শুভেচ্ছা জানিয়ে যাই তোমাদের জীবন সুখের হোক। ডাকো তোমার বন্ধুকে, তাকেও আলাদা একখানা কার্ড দিয়ে যাই।

নয়না খুব শান্ত গলায় বললো—আলাদা করে আমার কোনো বন্ধু নেই দীপক, প্রবীর আমাদের সকলের বন্ধু। শুধু সেটা তোমাদের কিছুতেই মনে থাকে না। কিন্তু ভারী মিস্ করলো সে বেচারা এই

ভোজটা। ...বেচারী এই কালই দিল্লী রওনা হয়ে গেলো, সেখান থেকে সোমবারের প্লেনে হামবুর্গ যাচ্ছে—

দীপক বসে পড়ে বললো—তার মানে ?

মানে আর কী, পড়তে গেলো।

আর তুমি ?

দীপক গলায় পাথর আটকানো স্বরে বললো—তুমি গেলে না ?

নয়না হঠাৎ খুব সুন্দর করে হেসে উঠলো। হেসে বললো—ওমা, আমি যাবো কি বলে ? কেনই-বা যাবো ?

দীপক তার চির অভ্যস্ত শৌখিন ভঙ্গীতে কথা বলা ছেড়ে দিয়ে বোকার মতো বলে উঠলো—তোমাদের বিয়ে হয়ে যায়নি ?

নয়না আবার হাসলো—উঃ দীপক, তুমি যেন ঠিক করেছো আজ আমায় হাসিয়ে মারবে। কার সঙ্গে কার বিয়ে ?

দীপক রুদ্ধ গলায় প্রায় আর্তস্বরে বলে উঠলো—'রত্না'।

রত্না আর জোর দেখাতে সাহস করলো না, আস্তে বললো—আমি তো তাই শুনেছিলাম।

যেহেতু ঈশ্বর এখন ফতুর তাই তাঁর আর কিছু করবার নেই। এখন শুধু অপেক্ষা করা তাঁর যবনিকার অন্তরালে আর কী আছে।

তবু—

পত্রলেখা বলেছিলো—বাবা, এখনো সময় আছে, আপনি দিল্লীতে টেলিগ্রাম টেলিফোন যা হোক কিছু করে ওকে আটকান।

বিধুশেখর অবাক হয়ে বললেন—ওকে আটকে কী হবে ?

আঃ বাবা, আপনাকে আর আমি কী বোঝাবো। সব শুনবেন পরে, এখন আপনি—

নয়না পত্রলেখার মুখটা দু হাতে ধরে নিজের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে বললো—পাগলের ভূতটা কি বাড়ি থেকে চলে যায়নি ? একজনকে ছেড়ে আর একজনের ওপর ভয় করলো ? এইবেলা নিজেকে সামলে নিন পত্রলেখা দেবী।

পত্রলেখা ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো—যা, বেরো আমার সামনে থেকে। দূর হ।

নয়না হেসে বললো—সে আশা ছাড়ুন পত্রলেখা দেবী। আপনার সামনে থেকে ইহজীবনে আর দূর হচ্ছি না।

বললো—

কারণ নয়নার কাছে ভালোবাসা একটাই মানে।